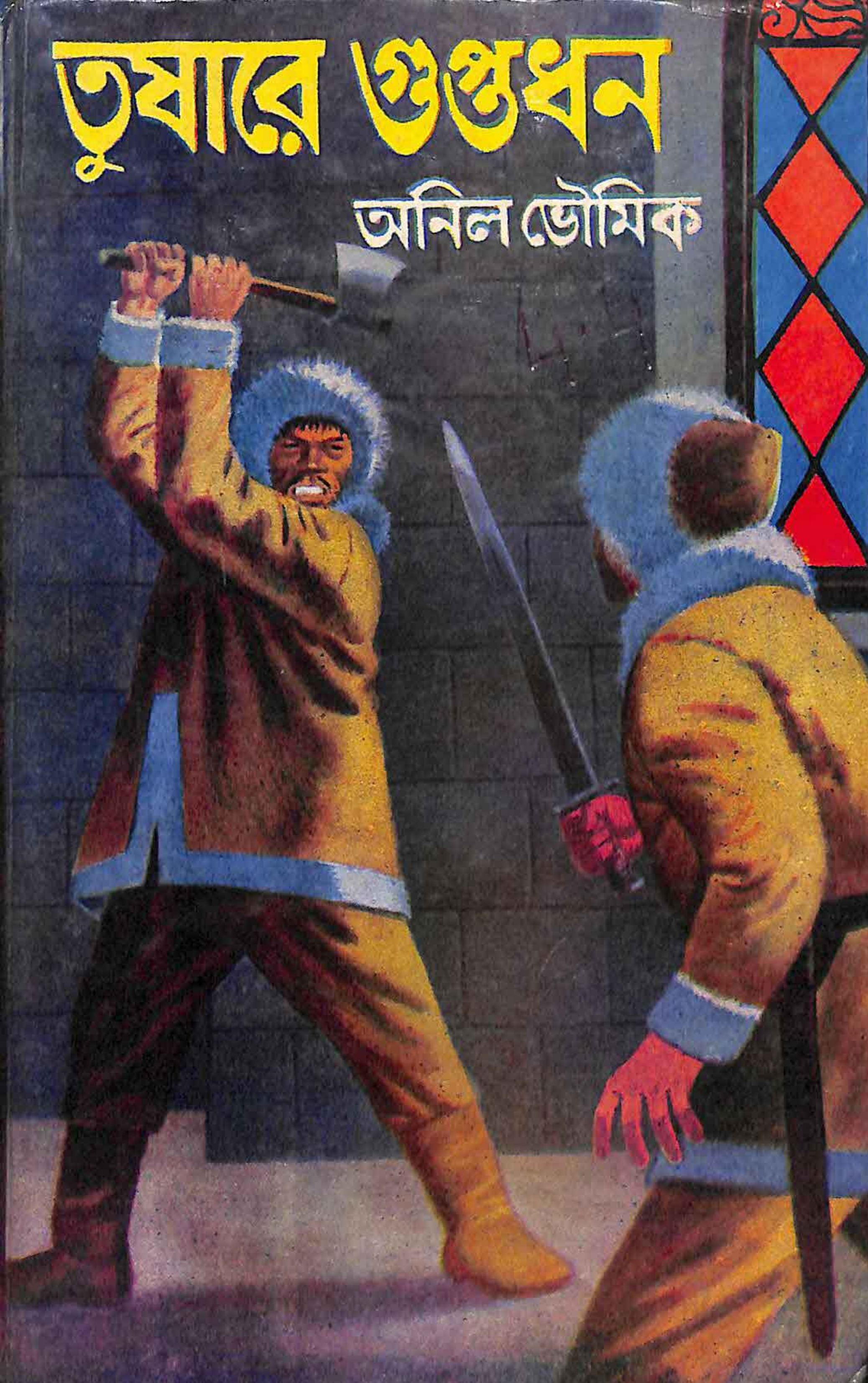
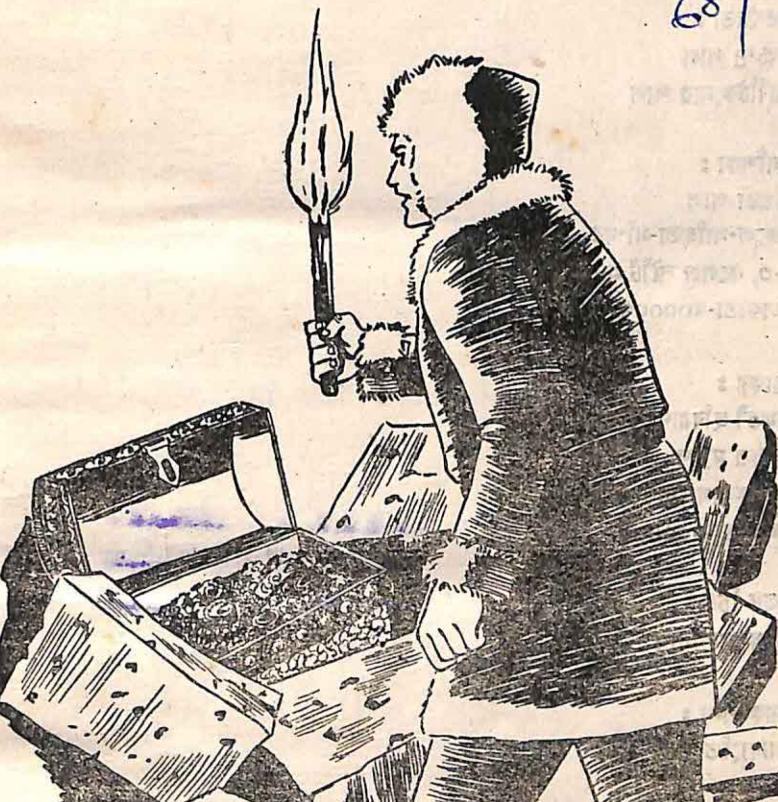
তুষারে গুপ্তধন

অনিল ভৌমিক



তুষারে গুপ্তধন

অনিল ভৌমিক



উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

কলিকাতা-৭০০০০৭

TUSHARE-GUPTADHAN
by Anil Bhowmick
Rs. 10·00
Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3 College Street Market
Calcutta-700007 (1st floor)

প্রথম প্রকাশ ঃ
আশ্বিন, ১৩৯০
অক্টোবর, ১৯৮৩
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ
বৈশাখ, ১৩৯৩
মে; ১৯৮৬

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে)
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীমতী ছবিরাণী হাজরা
দিবাকর মুদ্রণ
৫৮. কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ চিত্র ঃ
নারায়ণ দেবনাথ

পরিকল্পনা ঃ
দিব্যদ্যুতি পাল

প্রচ্ছদ মুদ্রণে ঃ
নিউ গয়া আর্ট প্রেস

দশ টাকা

উৎসর্গ

দুই বাংলার কিশোর-কিশোরীদের

উদ্দেশ্যে—

নিবেদন

এই উপন্যাসটা আমার সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। গ্রীনল্যান্ড ও উত্তরমেরু সম্পর্কিত যে ক'টা বই পড়েছি, তা'তে একমাত্র উত্তরমেরু-বিজয়ী পিয়েরীর "নর্থপোল" বইতে এস্কিমোদের সম্পর্কে বলা আছে যে, শীতকালে কখনও-কখনও অথবা স্থানান্তরে বাস উঠিয়ে দিয়ে যাবার সময় এস্কিমোরা 'ইগলু' অর্থাৎ বরফের ঘরে থাকে। আমার কাহিনীর ঘটনাস্থল যেহেতু গ্রীনল্যান্ড—উত্তরমেরু নয়, সেজন্যে 'ইগলু'তে বসবাসের কথা আসে নি। চামড়ার তাঁবু অর্থাৎ 'টুপিক' এবং পাথরের ঘরে বসবাসের কথা বলছি।

আমি সবচেয়ে বেশী তথ্য পেয়েছি এবং উপকৃত হয়েছি দুটি বই প'ড়ে। —ডি. স্টিফানসনের "গ্রীনল্যান্ড" ও কেন্ট কেন-এর "আর্কটিক এক্সপ্লোরেশন"।

ফ্রান্সিস-কাহিনীর এটা চতুর্থ পর্ব হ'লেও স্বয়ং-সম্পূর্ণ কাহিনী বলা যেতে পারে। এই উপন্যাস পূর্বে অন্য কোথাও কখনও প্রকাশিত হয় নি। নমস্কারান্তে—

অনিল ভৌমিক

তুষারে গুপ্তধন

জাহাজ চলেছে ভাইকিংদের স্বদেশের দিকে। সমুদ্র শান্ত। হাওয়ার বেগও যথেষ্ট। পালগুলো প্রায় বেলুনের মত ফুলে উঠেছে। নিরুদ্বেগ সমুদ্রযাত্রা। ভাইকিংরা সকলেই খুশী। অনেকদিন পর স্বদেশে ফিরে চলেছে। হাওয়া ভাল থাকতে দাঁড় টানতে হচ্ছে না। শুধু ডেক ধোয়া-মোছা, পালের দড়ি ঠিক-ঠাক করা এসব কাজ। সে আর কতক্ষণের কাজ। বাকী সময় ওরা হৈ-হল্লা ক'রে, ছক্কা-পাঞ্জা খেলে। গান গায়, বাজনা বাজায়, নাচে। রাত হ'লে ডেকের এখানে ওখানে সবাই গোল হ'য়ে বসে। দেশের বাড়ীর গল্প করে। সোনার ঘণ্টা নিয়ে গেছে ওরা, অতবড় দু'টো হীরে। এবার নিয়ে যাচ্ছে হাঁসের ডিমের মত মুক্তো। দেশের লোকেরা অবাক হ'য়ে যাবে। মানুষের কল্পনাতেও আসে না এতবড় মুক্তো। কী সম্বর্ধনাটাই না ওরা পাবে।

ফ্রান্সিস, হ্যারি দুই বন্ধুও খুশী। তবে ফ্রান্সিস মাঝে-মাঝে বলে হ্যারিকে—'দেখ ভাই, দেশে না পেঁছানো পর্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারবো না। জানো তো হীরে নিয়ে যাবার সময় কী ক'রে লা ব্রুশের পাল্লায় পড়েছিলাম।'

হ্যারি হেসে বলে—'মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করছো। এবার অনেক সাবধান হ'য়েছি।'

—'তবু বলা যায় না কিছু।' ফ্রান্সিস বলে। হ্যারি ঠিকই বলেছে। এবার জাহাজের পাহারাদারের সংখ্যা বাড়ানো হ'য়েছে। প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন রাত জেগে পাহারা দেয়। পরের দিন বাকীরা। ঘরে-ঘরে সকলের ওপরই রাত জেগে পাহারা দেবার ভার পড়ে। ফ্রান্সিস, হ্যারি, বিস্কো কেউ বাদ যায় না। তবে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা হ্যারিকে সারারাত জাগতে দেয় না। ওকে জোর ক'রে ঘুমুতে পাঠিয়ে দেয়। হ্যারি বড় একটা সুস্থ থাকে না। এটা-ওটা লেগেই আছে। হ্যারি তাই দুঃখ ক'রে বলে—'ফ্রান্সিস আমাকে না আনলেই ভালো করতে।'

ফ্রান্সিস মাথা নাড়ে। বলে—'তোমাকে ছাড়া আমি কোথাও বেরোবেই না।'

—তোমাদেরই তো ভোগান্তি।

—'হোক ভোগান্তি।' তারপর থেমে বলে—'এ্যান্তনীকে সেই জন্যেই সঙ্গে এনেছিলাম। এ্যান্তনী রাজ-চিকিৎসকের সাগরেদ। ও অনেক ওষুধ-পত্তরও সঙ্গে এনেছে। কখন কে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, কে আহত হয়। চিকিৎসা করতে হবে তো।'

—'তারপর বরাবরের রোগী আমি তো আছিই।'

দু'জনেই দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

হ্যারী এর মধ্যেই একদিন গুরুতর অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। সেদিন বিকেলে হ্যারি ডেকে দাঁড়িয়ে দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে, হঠাৎ ওর মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। তারপর বুকে একটা মোচড়। দু'হাত শূন্যে তুলে হ্যারি ডেকের ওপর পড়ে গেল। ধারে কাছে যারা ছিল ছুটে এল। হ্যারির মুখটা তখন বেঁকে গেছে। হাত-পা শক্ত কাঠ। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে। চোখে শূন্য দৃষ্টি। খবর পেয়ে ফ্রান্সিস ছুটে এল। একটু পরে এ্যান্তনী ওর ওষুধ রাখার বেতের বাক্সটা নিয়ে এল। ও হ্যারির

শক্ত হাত-পা বারকয়েক টানাটানি করল। তারপর বুকে কান চেপে রাখল। নাকের সামনে আঙ্গুল রাখল। খুব ধীরে শ্বাস পড়ছে। প্রায় বোঝাই যায় না। বুকে হৃদস্পন্দনও অস্পষ্ট। বেতের বাক্স খুলে একটা চিনেমাটির বোয়াম বের করল। দু'হাত তুলে সবাইকে বলল—'স'রে যাও—হাওয়া ছাড়ো।'

সবাই স'রে গেল। এ্যান্তনী বোয়াম থেকে আঙ্গুলের ডগায় ক'রে ওষুধ বার করল। তারপর হ্যারির নাকের কাছে ধরল। হ্যারি সেই শক্ত হাত-পা নিয়ে একই-রকম ভাবে শুয়ে রইল। এ্যান্তনী কিছুটা ওষুধ হ্যারির নাকে লাগিয়ে দিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর হ্যারির মুখ থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরুলো। কয়েকবার মাথাটা এ'পাশ-ও'পাশ ক'রে হ্যারি সহজ দৃষ্টিতে তাকালো। মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকিয়ে নিল। শক্ত হাত পা নরম হ'ল। ও আস্তে-আস্তে উঠে বসল। ফ্রান্সিস ওর মুখের ওপর ঝুঁকে বলল—'এখন কেমন লাগছে?'

—'একটু ভালো।' দুর্বল স্বরে হ্যারি বলল—'আমার কী হয়েছিল?'

—'কিছু না, মাথা ঘুরে গিয়েছিল বোধহয়।'

—'মাথা ঘুরে গিয়েছিল ঠিকই, তারপর বুকে একটা চাপা ব্যথা। তারপর সব কেমন অন্ধকার হ'য়ে গেল'।

—'ও ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবিনে যেতে পারবে? আমার কাঁধে ভর দিয়ে?'

—'বোধহয় পারবো।'

হ্যারি উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু পারলো না। বোঝা গেল, ওর শরীরের দুর্বল ভাবটা এখনও কাটে নি। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে ওর হাতটা নিজের কাঁধে তুলে নিল। তারপর ধরে-ধরে আস্তে-আস্তে সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলল। হ্যারিকে বিছানায় শুইয়ে দিল ফ্রান্সিস। অল্পক্ষণের মধ্যেই হ্যারি অনেকটা সহজ হল। এ্যান্তনী একটা একটা মোটা কাপড়ের পুঁটুলি থেকে দু'টো কালো-কালো বড়ি বের করল। হ্যারির হাতে দিয়ে বলল—'খেয়ে নাও।'

একজন জলের গ্লাস নিয়ে এল। হ্যারি বড়ি দু'টো খেয়ে নিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল ও। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। এবার ফ্রান্সিস এ্যান্তনীকে জিজ্ঞেস করল 'হ্যারির কী হয়েছে?

—'ঠিক বুঝতে পারছি না।' এ্যান্তনী বেতের বাক্স বন্ধ করতে-করতে বলল—'মনে হয় মৃগী রোগের মত কিছু। দেশে ফিরে ওর ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।'

—'হুঁ।'

ফ্রান্সিস মুখ নীচু করে কি যেন ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর কেবিন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর যারা ছিল তারাও বেরিয়ে এল।

জাহাজ চলেছে। দু'-একবার অল্প ঝড় উঠেছিল সমুদ্রে। কিন্তু জাহাজের কোন ক্ষতি করতে পারে নি। দিন-রাত জাহাজ পাহারা দেওয়া চলল। শুধু হ্যারিকে কোন কাজে ডাকা হতো না। হ্যারি এখন মোটামুটি সুস্থ। ও কাজ-টাজ করতে চায়। কিন্তু ফ্রান্সিস চড়া গলায় বলে দিয়েছে—'তোমাকে কোন কাজ করতে হবে না। এখন শুধু বিশ্রাম।'

হ্যারি আর কি করে। চুপচাপ শুয়ে-বসে থাকে। ফ্রান্সিসরা ওর ঘরে আসে।

গল্প-টল্প করে ওর সঙ্গে। ফ্রান্সিস মাঝে-মাঝে ওকে ডেকের ওপর নিয়ে যায়। ফ্রান্সিসের হাত ধরে আস্তে-আস্তে পায়চারী করে। কিছুদিন যেতে হ্যারি সুস্থ হয়ে উঠল। আগের মতই কাজকর্ম করতে লাগল।

পর্তুগালের কাছাকাছি আসতে ফ্রান্সিসদের জাহাজটা এক প্রকাণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ল। তখন বিকেল। সূর্য অস্ত যায়-যায়। হঠাৎ একটা কালো মেঘ উঠল পশ্চিম আকাশের দিকে। সেই মেঘ বড় হতে-হতে, ছড়াতে-ছড়াতে সমস্ত আকাশ ঢেকে দিল। ওর মধ্যে পূব আকাশটা কেমন আগুনরঙা হয়ে উঠল। টিপ-টিপ বৃষ্টি পড়তে লাগল। সারা আকাশ জুড়ে ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। আঁকা-বাঁকা বিদ্যুৎরেখা সারা আকাশ চিরে ফেলতে লাগল যেন। তারপরই হঠাৎ প্রচণ্ড গোঁ-গোঁ শব্দ উঠল। তারপরই বিরাট-বিরাট ঢেউ ছুটে এলো। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বাতাস। ঢেউগুলো কান-ফাটানো শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসদের জাহাজের ওপর। ভাইকিংরা অভিজ্ঞ নাবিক। ওরা আকাশের চেহারা দেখেই বুঝেছিল, বেশ বড় রকমের ঝড় আসছে। ওরা সমস্ত পাল নামিয়ে ফেলেছিল। দাঁড়গুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর তৈরী হয়ে ডেকে এসে দাঁড়িয়েছিল ঝড়ের মোকাবিলা করবার জন্য।

কিন্তু ওরা যতটা আশঙ্কা করেছিল, ঝড় তার চেয়েও ভয়াবহ চেহারা নিল। মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে মুহুর্মুহু জলের উত্তাল ঢেউ, জাহাজের ডেকের ওপর ভেঙে পড়তে লাগল। ভাইকিংরা ঐ প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কার মধ্যে, পালের দড়ি মাস্তুল হুইল আঁকড়ে ধরে রইল। সবাই ভিজে জবজবে হয়ে গেল। যে হুইল ধরে দাঁড়িয়েছিল, সে ওর মধ্যেই হুইল ঘুরিয়ে চলল। জাহাজের গতি পরিবর্তন করে ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপটায় মোকাবিলা করতে লাগল। জাহাজের প্রচণ্ড দুলুনির মধ্যে পা ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কয়েকজন পারলও না পা ঠিক রাখতে। রেলিঙের গায়ে, মাস্তুলের গায়ে ধাক্কা খেয়ে কয়েকজন আহতও হল। একেবারে নতুন জাহাজ। তাই ঝড়ের এই প্রচণ্ডতা সহ্য করতে পারল। মাত্র আধঘণ্টা ঝড় চলল। তাতেই সবাই কাহিল হয়ে পড়ল। ঝড় কমল। অল্প-অল্প বৃষ্টি চলল কিছুক্ষণ। তারপরেই আকাশ পরিষ্কার। সন্ধ্যার আকাশে আবার তারা ফুটল।

তারপরে আর ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হল না। কিছুদিন পরেই জাহাজ ভিড়ল ভাইকিং দেশের বন্দরে। অনেকদিন পর দেশে ফেরা। সকলেই খুশী। তার ওপর অত বড়-বড় মুক্তো নিয়ে ফিরেছে। দেশের মানুষেরা তো তাই দেখে অবাক হয়ে যাবে।

জাহাজটা যখন জাহাজঘাটায় ভিড়ল, তখন ভোর হয়-হয়। জাহাজঘাটায় লোকেরা তাকিয়েও দেখল না ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে। তারা তো জানে না কি নিয়ে, কত দূর দেশ পাড়ি দিয়ে, এই জাহাজ আসছে। ফ্রান্সিসের বন্ধুদের আর তর সইল না। ওরা বাড়ী যাবার জন্যে বার-বার ফ্রান্সিসকে বলতে লাগল। ফ্রান্সিস আর কী করে। ওদের বাড়ী যেতে অনুমতি দিল। শুধু বিস্কোকে বলল—'রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজাকে জানিয়ে যাবে যে, আমরা ফিরেছি। সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত মূল্যবান মুক্তো। রাজা-মশাই যেন এসব নিয়ে যাবার জন্যে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দেন।'

সৈন্যদল না আসা পর্যন্ত ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজে থাকবে, এটাই স্থির হল। বন্ধুরা সব হৈ-হৈ করতে করতে পথে নামল, তারপর গাড়িভাড়া করে ছুটল যে-যার

বাড়ির দিকে। আধঘণ্টার মধ্যে একদল অশ্বারোহী সৈন্য এল। সৈন্যদের দলপতি জাহাজে উঠে ফ্রান্সিসের কাছে এল। সসম্মানে রাজার একটা চিঠি ওর হাতে দিল। মোটা কাগজে মোড়ানো চিঠিটা খুলে ফ্রান্সিস পড়ল—'তুমি আর হ্যারি অপেক্ষা করবে। আমার গাড়ি যাবে তোমাদের আনতে।'

হ্যারি চিঠিটা পড়ে বলল—'এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

সৈন্যরা! জাহাজের দেখ্যশুনোর ভার নিল। ফ্রান্সিসের কেবিন ঘরে একটা বড় কাঠের বাক্সে মুক্তোগুলো রাখা ছিল। সৈন্যরা পাহারা দিতে লাগল সেই কেবিন ঘর।

এরমধ্যে শহরে রটে গেছে বড়-বড় অনেক মুক্তো নিয়ে ফ্রান্সিসদের ফেরার কথা। আস্তে-আস্তে জাহাজঘাটায় লোক জমতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই উৎসুক জনতার ভীড় বাড়তে লাগল। ভীড় ক্রমে জনসমুদ্রে পরিণত হ'ল। রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেল। উৎসুক জনতা ধ্বনি দিতে লাগল—'ফ্রান্সিস, দীর্ঘজীবী হও।' তারপর চীৎকার শুরু হ'ল—'আমরা ফ্রান্সিসকে দেখতে চাই।'

কেবিন ঘরে ব'সেছিল ফ্রান্সিস আর হ্যারি। হ্যারি হেসে বলল—'আর লুকিয়ে থাকা চলবে না। চলো ডেকে-এ গিয়ে দাঁড়াই।'

—'আমার এসব আর ভালো লাগে না।' বিরক্তির সঙ্গে বলল ফ্রান্সিস।

—'উপায় নেই, চলো'—বলে হ্যারি উঠে দাঁড়াল। উঠতে হ'ল।

দু'জনে ডেক-এ এসে দাঁড়াতেই মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠল—'ফ্রান্সিস দীর্ঘজীবী হও'। দু'জনেই হেসে হাত নাড়তে লাগল। উৎসুক জনতা মুক্তোগুলো দেখতে চেয়ে চীৎকার করতে লাগল। ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে ওর বাছাই করা মুক্তোটা বের করল। তারপর হাত তুলে দেখাতে লাগল। জনারণ্যে চাঞ্চল্য জাগল। সকলেই অবাক—এত বড় মুক্তো! অনেকক্ষণ ধরে করতালি চলল। সে শব্দে কান পাতা দায়। আবার শুরু হ'ল ধ্বনি—'ফ্রান্সিস দীর্ঘজীবী হও।'

এর মধ্যে রাজার পাঠানো আটটা ঘোড়ায় টানা গাড়িটা এল। জনতার ভীড় স'রে গিয়ে পথ ক'রে দিল। গাড়ির চালকের মাথায় পালকগোঁজা টুপী। পরণে জেল্লাদার পোষাক। ঘোড়াগুলি সুসজ্জিত। কালো গাড়িটার গায়ে সোনালী পাতের কারুকাজ। গাড়িটা জাহাজঘাটায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি জাহাজ থেকে নেমে এল। উঠল গাড়িটায়। তখনও জনতার উল্লাসধ্বনি চলেছে। ওদের নিয়ে গাড়ি চলল রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে।

গাড়ির সামনে ও পেছনে দু'দল সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য চলল। জনসমুদ্রের মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে গাড়ি চলল। দর্শকের অনুরোধে ফ্রান্সিসকে মাঝে-মাঝে মুক্তোটা তুলে দেখাতে হ'ল। অতবড় মুক্তো দেখে সবাই হতবাক। পরক্ষণেই উল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠেছে সবাই।

একসময় রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটক পেরোল গাড়িটা। ফ্রান্সিসরা দেখল রাজপ্রাসাদের বড়-বড় সিঁড়িগুলির ওপর লাল কার্পেট পাতা। সিঁড়িগুলি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে রাজা ও রাণী দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান-প্রধান অমাত্য ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। আবার রাজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন মন্ত্রীমশাই, ফ্রান্সিসের বাবা।

গাড়ি এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস, হ্যারি গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। সমবেত সকলেই করতালি দিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানাল। ওরা প্রথমে রাণীর কাছে দাঁড়াল। রাণীর পরণে একটা গোলাপী রঙের গাউন। গলায় ছোট-ছোট মুক্তোর হার। রাণী হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। দু'জনেই বাঁ পা ঝুঁকিয়ে মাথা নীচু ক'রে রাণীর হস্ত চুম্বন করল। রাজার দিকে ফিরে দাঁড়াতেই রাজা ফ্রান্সিসকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর হ্যারিকে। রাজা শুধু বললেন—'তোমরা আমার দেশের গৌরব।'

হঠাৎ রাজার পেছন রাজকুমারী মারিয়া এগিয়ে এল হাসতে-হাসতে।

ফ্রান্সিস এতক্ষণ মারিয়াকে দেখতেই পায়নি। ওরা দু'জনে মাথা ঝুঁকিয়ে রাজকুমারীর হস্ত চুম্বন করল। একটা দিকে সবুজ রঙের গাউন পরে আছে মারিয়া। ফ্রান্সিসের মনে হ'ল যেন সবুজ ডাঁটায় সদ্য ফোটা একটা লিলাক ফুল। মারিয়া হাস্যোজ্জ্বলমুখে ব'লে উঠল—'আমার জন্যে যে মুক্তো আনবেন বলেছিলেন।'

—'এই যে'-ফ্রান্সিস কোমরের ফেট্টি থেকে মুক্তোটা বের ক'রে মারিয়ার হাতে দিল। মুক্তোটা হাতে নিয়ে মারিয়া খুশীতে মাথা দুলিয়ে হেসে উঠল। বাবা ও মাকে মুক্তোটা দেখাতে লাগল। ওদিকে সমবেত আমত্যরা অভিজাত ব্যক্তিরা হাঁ হয়ে দেখতে লাগল সেই মুক্তোটা। এতবড় মুক্তো? এ-যে মানুষের কল্পনার বাইরে। বেশ গুঞ্জন উঠল সেই ভীড়ের মধ্যে।

ফ্রান্সিস বলল—'রাজকুমারী।'

—'বলুন।' মারিয়া খুব খুশীভরা চোখে ওর দিকে তাকাল।

—'জাহাজে আরও মুক্তো রয়েছে। তাই থেকেও মুক্তো বেছে নিতে পারেন।'

—'না।'—মারিয়া মাথা ঝুঁকিয়ে আস্তে-আস্তে বলল—'আপনি যেটা দিয়েছেন, সেটাই আমি নেবো।'

একথা শুনে ফ্রান্সিসও খুশী হ'ল। কারণ ও খুব যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছিল বাছাই করা মুক্তোটা।

রাণী একটু এগিয়ে এসে ডাকলেন—'ফ্রান্সিস।'

ফ্রান্সিস সসম্ভ্রমে বলল—'বলুন।'

—'আজকে রাত্রে এখানে তোমাদের সকলের নিমন্ত্রণ। তোমরা সবাই আসবে।'

—'নিশ্চয়ই রাণী-মা।' ফ্রান্সিস মাথা ঝুঁকিয়ে বলল।

এবার রাজামশাই উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—'কালকে জমকালো মিছিল ক'রে মুক্তোগুলো জাহাজ থেকে এখানকার যাদুঘরে আনা হবে। আগামী দু'দিন দেশব্যাপী আনন্দ উৎসব হবে।'

সকলেই করতালি দিল। এদিকে রাজপ্রাসাদের বাইরে উৎসুক সাধারণ মানুষের ভীড় বাড়তে লাগল। সকলেই ফ্রান্সিসকে দেখতে চায়। রাজার ঘোষণাটা তাদের মধ্যে প্রচারিত হ'ল। সকলে সমস্বরে ধ্বনি দিল—'আমাদের রাজা দীর্ঘজীবী হোন।'

রাজার এই ঘোষণা প্রচার করতে একদল অশ্বারোহী সৈন্য বেরিয়ে পড়ল।

এবার ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে এসে রাজামশাইকে বলল—'আমরা অনেকদিন ঘর-ছাড়া আমাদের যেতে অনুমতি দিন।'

—'নিশ্চয়ই। তোমরা এবার বাড়ি যাও।' রাজা বললেন।

সকলেই রাজা-রাণী ও রাজকুমারীকে সম্মান জানিয়ে নিজেদের গাড়িতে গিয়ে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও রীতিমাফিক রাজা-রাণী ও রাজকুমারীর কাছে বিদায় নিল। ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামছে তখনই ফ্রান্সিস শুনল, পেছন থেকে ওর বাবা বলছেন—'তোমরা দু'জনে আমার গাড়িতে গিয়ে ওঠ।'

ফ্রান্সিস কোন কথা না ব'লে হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ওর বাবার গাড়িতে গিয়ে উঠল। ওর বাবাও এসে বসলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়ি প্রাসাদের বাইরে আসতেই সমবেত জনতা ধ্বনি দিল—'আমাদের রাজা দীর্ঘজীবী হোন। ফ্রান্সিস দীর্ঘজীবী হোক'।

সকলেই ফ্রান্সিসদের গাড়ির কাছে এগিয়ে আসতে চায়। ভালো ক'রে দেখতে চায় ওদের। ফ্রান্সিস আর হ্যারি হেসে হাত নাড়তে লাগল। গাড়ি আস্তে-আস্তে চলল। ভীড় ছাড়িয়ে গাড়ি দ্রুত ছুটল। হ্যারির বাড়ির কাছে এসে থামল।

হ্যারি নেমে যাবার সময় বলল—'রাত্তিরে দেখা হচ্ছে।'

এবার বাবার সঙ্গে একা। গাড়ি চলেছে। আবাল্য-পরিচিত শহরের রাস্তাঘাট। ভালোই লাগছিল ফ্রান্সিসের। কতদিন পরে এখানে ফিরল। হঠাৎ কেন জানি মা'র জন্যে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। ও থাকতে না পেরে বলল—'মা কেমন আছেন?'

—'শয্যাশায়ী।' বাবা গম্ভীর গলায় বলল।

ফ্রান্সিস চমকে উঠল—'বলো কি বাবা?'

বাবা আর কোন কথা বললেন না।

—'বৈদ্যিরা কী বলছে?'

—'নানা রকম অসুখের কথা বলছে। তবে আমার মনে হয়'—

বাবা একটু কাশলেন—'তোমার জন্যে ভেবেভেবেই এই অবস্থা'।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না।

বাড়ির গেটের সামনে গাড়িটা এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস গাড়ি থেকে নেমে দেখল দেওয়ালের গায়ে জড়ানো লতাগছেটা আরো অনেক দূর ছাড়িয়েছে। নীল ফুলে ছেয়ে আছে দেওয়ালটা। বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখল বাগানটা অযত্নে শ্রীহীণ হয়ে আছে। কিছু আগাছাও গজিয়েছে এখানে-ওখানে।

এবার ফ্রান্সিস ভেবে বুঝল—মা নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে। কে আর বাগানের দিকে লক্ষ্য রাখবে। বাড়িতে ঢুকে ফ্রান্সিস আর অন্য কোনদিকে তাকাল না। ছুটল মা'র শোবার ঘরের দিকে। দোরগোড়া থেকেই ডাক দিল—'মা—মা গো।'

ওর মা তখন একটা বালিসে ঠেসান দিয়ে আধশোয়া হয়ে শুয়েছিলেন। ফ্রান্সিস দেখল, মা আরো রোগা হয়েছে। মুখের কপালের বলিরেখাগুলো আরও স্পষ্ট হয়েছে।

চোখ কুঁচকে মা ওর দিকে তাকিয়ে বলল—'ফ্রান্সিস এসেছিস বাবা?'

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলতে পারল না। ওর বুক ঠেলে কান্না এল। কিন্তু ও কাঁদল না। জানে ওর চোখে জল দেখলে মা আরো দুর্বল হয়ে পড়বে। ছুটে গিয়ে মা'কে জড়িয়ে ধরল। মা-ও ওর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে শান্তস্বরে

বলতে লাগল—'কবে যে আর এসব পাগলামি যাবে। তোর বাবা তোর জন্যে এত ভাবে, যে কী বলবো। কত রাত দেখেছি, বারান্দায় পায়চারী করছে।'

কথা বলতে-বলতে মা'র চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল। ফ্রান্সিসও বুকে একটা শূন্যতা অনুভব করল। অনেকক্ষণ মা'কে জড়িয়ে ধরে থেকে নিজের আবেগ সামলাল।

মা বলে উঠল—'নে ওঠ, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নে।'

ফ্রান্সিস মুখ তুলল। বলল—'এখন কেমন আছ মা ?'

—'তুই এসেছিস, এবার ঠিক ভালো হয়ে যাবো।'

—'তুমি ভালো না হওয়া পর্যন্ত আমি দূরে কোথাও যাবো না।'

—'কথা দিলি, মনে থাকে যেন।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ফ্রান্সিস ভেবেছিল একা-একা খেয়ে নেবে। কিন্তু সেটা হল না। খাবার টেবিলে বাবার মুখোমুখি বসে। দুজনেই চুপচাপ খেতে লাগল।

একসময় বাবা বলল—'আবার কোথাও বেরোবে নাকি ?'

—'না। মা ভালো না হওয়া পর্যন্ত আমি বাড়িতেই থাকবো।'

—'তাহ'লে বাড়িতে পাহারাদার রাখার প্রয়োজন নেই ?'

—'না।'

—'ভাল।'—আর কোন কথা না বলে বাবা খেতে লাগলেন।

অনেকদিন পরে নরম বিছানায় শান্ত পরিবেশে শুয়ে ফ্রান্সিস জেগে থাকতে পারল না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। একটানা বিকেল পর্যন্ত ঘুমলো ও।

* * *

সন্ধ্যের পর থেকেই মা'র তাগাদা শুরু হলো—'রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ। যা, ভালো পোষাক-টোষাক পরে নে।'

মা বিছানায় শুয়ে শুয়েই পরিচারিকাকে দিয়ে ফ্রান্সিসের পোষাক গুলো আনাল। তাই থেকে বেছে-বেছে একটা খুব ভালো পোষাক বের করল। ফ্রান্সিস বেশ কষ্ট করে পোষাকটা পরল। বোতাম-টোতাম আটকাল। গলা পর্যন্ত আঁটা সেই পোশাক পরে ওর অস্বস্তিই হতে লাগল। কিন্তু উপায় নেই। রাজবাড়ির নিমন্ত্রণ।

ও যখন সেজেগুজে মা'র কাছে এল, তখন মা ওকে দেখে খুশীই হলো। পোশাকটা বেশ মানিয়েছে ফ্রান্সিসকে। মা ওর গায়ে সেন্ট ঢেলে দিল। বাবাও ইতিমধ্যে তৈরী হয়ে নিয়েছিলেন দু'জনে গিয়ে উঠতেই গাড়ি চলল রাজবাড়ীর দিকে।

রাজপ্রাসাদের সিঁড়ির নীচের চত্বরে অনেক গাড়ি ঘোড়া। গাড়ি-গুলোর গঠন-ভঙ্গীও বিচিত্র। বোঝা গেল, অনেক লোকজন এসেছেন।

আলোকোজ্জ্বল বিরাট হলঘরের একদিকে রাজা-রানী বসে আছেন—পিঠের দিকে উঁচু বিরাট দু'টো চেয়ারে। রাজার পরণে সোনালী-রুপালী কাজ করা পোষাক। রানীও খুব সেজেছেন। পরণে চকচকে রুপোলী সাটিনের পোষাক। কাঁধের কাছে ঝালর দেওয়া টকটকে লাল কাপড়ের ফুল! রানী ফ্রান্সিসকে দেখে হাসলেন তারপর ডান হাতের দস্তানাটা খুলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফ্রান্সিস প্রথমতঃ হাতে চুম্বন করল। রাজাও ফ্রান্সিসকে দেখে হাসলেন। রাজা-রানীর পাশের চেয়ারটা খালি ছিল

এতক্ষণ। হঠাৎ দেখা গেল. রাজকুমারী মারিয়া নাচের আসরের দিক থেকে এগিয়ে আসচে। দুধের মত সাদা। একটা গাউন পরণে। সকালের চেয়ে এখন আরো বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে। একটু হাঁপাচ্ছেও। বোধহয় নেচে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিসকে দেখে মারিয়া হাসল। তারপর বলল—'আমার সঙ্গে খেতে বসবেন। মুক্তোর সমুদ্রের গল্প শুনবো।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে হাসল। মারিয়া নিজের চেয়ারটায় বসে পড়ল। ফ্রান্সিস এবার ওখান থেকে সরে এসে ভীড়ের মধ্যে বন্ধুদের খুঁজতে লাগল।

প্রথমেই বিস্কোর সঙ্গে দেখা। বেশ জমকালো পোষাক পরেছে। বিস্কো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, বোধহয় নাচের সঙ্গিনী খুঁজছে। অন্যসব বন্ধুদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই দেখা হলো। বাকিরা সব মহানন্দে বাজনার তালে-তালে নাচছে।

হঠাৎ একটা খুব রঙচঙে পোষাকপরা মেয়ে এসে ফ্রান্সিসের সামনে দাঁড়াল। ভুরুর ভঙ্গী করে বলল, 'নাচবেন আসুন।'

ফ্রান্সিস খোঁড়াতে-খোঁড়াতে দু'পা পিছিয়ে গেল। মেয়েটি বলে উঠল—'কী হয়েছে আপনার ?'

ফ্রান্সিস মুখ-চোখ কুঁচকে বলল, 'ডান পা'টা মচ্‌কে গেছে। কাজেই বুঝতেই পারছেন।'

মেয়েটি দু'হাত ছড়িয়ে হতাশার ভঙ্গী করল, তারপর চলে গেল যেদিকে ফ্রান্সিসের অন্য সব বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস এদিক-ওদিক তাকিয়ে আড়াল খুঁজতে লাগল। একটাকে ঠেকানো গেছে। আবার কার পাল্লায় পড়তে হয়। ঘরের পেছনের দিকে দুটো বড় থাম। ফ্রান্সিস দ্রুত হেঁটে গিয়ে একটা থামের আড়ালে দাঁড়াল। অস্পষ্ট শিস্ দেওয়ার শব্দ শুনে পেছনে তাকাল। অন্য থামটার আড়ালে হ্যারি দাঁড়িয়ে হাসছে। ফ্রান্সিস একছুটে গিয়ে হ্যারির কাছে দাঁড়াল। বলল, 'খুব ভালো জায়গা বেছেছো। কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের।'

—'অত সহজে রেহাই পাবে না তুমি।' হ্যারি বলল।

—'তার মানে ?'

—'মারিয়া তোমাকে ঠিক খুঁজে বের করবে।'

—'দেখি, যতক্ষণ গা ঢাকা দিয়ে থাকা যায়।' একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, 'এত আলো-বাজনা-নাচ-জমকালো পোষাকপরা মেয়ে-পুরুষ, এর চেয়ে জাজিম্বাদের নাচের আসর অনেক সুন্দর, উপভোগ করার।'

ওরা দু'জনে এসব নিয়ে কথাবার্তা বলছে, হঠাৎ রাজকুমারী মারিয়া এসে হাজির। হাসতে-হাসতে বলল, 'ঠিক জানি আপনি এখানে লুকিয়ে আছেন। নাচবেন চলুন।'

ফ্রান্সিস হতাশভঙ্গিতে হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারি হাসি চাপতে মুখ ফেরাল। নাচের জায়গায় বেশ ভীড়। ওর মধ্যেই ফ্রান্সিস আর মারিয়া নাচতে লাগল। যখন নাচিয়েরা মারিয়ার সামনে পড়ে যাচ্ছে, তখনই মাথা নুইয়ে সম্মান জানাচ্ছে। নাচতে-নাচতে হঠাৎ সেই জমকালো পোষাকপরা মেয়েটি মুখোমুখি পড়ে গেল ফ্রান্সিসের। মেয়েটি অবাক-চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগল। ওর নাচের

জুটিকে কানে-কানে কী বলতে লাগল। ফ্রান্সিস সঙ্গে-সঙ্গে নাচ থামিয়ে হাত দিয়ে ডান হাঁটুটা চেপে ধরল। মারিয়া ব'লে উঠল,—'কী হলো?'

ফ্রান্সিস চোখ-মুখ কুঁচকে বলল—'সকালে হঠাৎ পা ফস্‌কে, মচ্‌কে গেছে।'

—'ইস্, আগে বলেন নি কেন? এই পা নিয়ে কেউ নাচতে আসে?'

—'কী করবো, আপনি ডাকলেন।'

—'তাই বলে, যাক গে আপনি বন্ধুদের কাছে যান।'

ফ্রান্সিস খোঁড়াতে-খোঁড়াতে নাচের আসর থেকে বেরিয়ে এল। আবার থামটার আড়ালে হ্যারির কাছে এসে দাঁড়াল। হ্যারি বেশ অবাকই হলো। বলল, 'এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেলে?'

ফ্রান্সিস হেসে নিজের মাথায় টোকা দিয়ে বলল, 'মস্তিষ্ককে কাজে লাগাও, অনেক সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে।'

থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ দু'জনে গল্প করে কাটাল। এক সময় ফ্রান্সিস বলে উঠল, 'কখন খেতে ডাকবে রে বাবা। এসব পোষাক-টোষাক পরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

একটু পরে ঢং করে ঘণ্টা বাজল। বাজনা থেমে গেল, নাচও বন্ধ হলো। সবাই পাশের ঘরে খাবার টেবিলের দিকে যেতে লাগল। আবার মৃদু বাজনা বেজে উঠলো। সবাই খাবার টেবিলের ধারে চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। রাজা ও রানী এলেন, সঙ্গে রাজকুমারী। তাঁর চেয়ারে আসন গ্রহণ করতে সব নিমন্ত্রিতরা বসলেন। রাজকুমারীর পাশের চেয়ারটা তখনও খালি। ফ্রান্সিস আর হ্যারি বসতে যাচ্ছে, হেড বাবুর্চি এসে ফ্রান্সিসকে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি রাজকুমারীর পাশে বসবেন।'

অগত্যা ফ্রান্সিসের আর হ্যারির পাশে বসা হলো না। ও রাজকুমারীকে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে রাজকুমারীর পাশের চেয়ারটায় বসল।

বিরাট লম্বা টেবিলে কত খাবার সাজানো। যে যেমন খুশী তুলে নিয়ে খাও। বাবুর্চিরাও টেবিলের চারপাশে ঘুরছে। যে-যা চাইছে, সন্তর্পণে প্লেটে তুলে দিচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া খুব জোরে চলছে। রাজকুমারী খেতে-খেতে বলল, 'আপনার মুক্তোটা লকেট করে একটা হার গড়াতে দিয়েছি।'

ফ্রান্সিস হাসল। বলল, 'মুক্তোটা আপনার পছন্দ হয়েছে?'

—'খুব'। রাজকুমারী বলল, 'এবার আপনার মুক্তোর সমুদ্রের গল্পটা বলুন।'

ফ্রান্সিস এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কী নিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে কথা বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ও জলদস্যু লা ব্রুশের হাতে ধরা পড়া থেকে গল্পটা শুরু করে দিল। মাঝে-মাঝে ভুলে যাচ্ছিল। তখন রাজকুমারী হেসে বলছিল, 'খেতে-খেতে বলুন।'

ফ্রান্সিস লজ্জিত মুখে খেতে শুরু করছিল তখন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলো, কিন্তু ফ্রান্সিসের গল্প শেষ হলো না। নিমন্ত্রিতরা রাজা-রানী রাজকুমারীকে সম্মান জানিয়ে একে-একে বিদায় নিতে লাগল। বিভিন্ন রকমের ঘোড়ার গাড়ী তাঁদের নিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও রাজা রানী ও রাজকুমারীকে সম্মান জানিয়ে বিদায় নিল। ওরা সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে,

তখনই হ্যারি ফিস করে বলল, 'রাজকুমারী তোমাকে লক্ষ্য করছে যেন।'

সঙ্গে-সঙ্গে ফ্রান্সিস খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। হ্যারি অবাক হয়ে বলল, 'কী হলো তোমার?'

—'কিছু না, চলো।' দু'জনে বাইরে চত্বরে এসে দাঁড়াল। বাবা আসতেই ফ্রান্সিস বলল—'বাবা, হ্যারিদের গাড়িতে যাচ্ছি'।

—'বেশ, কিন্তু সোজা বাড়ি।' মন্ত্রীমশাই চ'লে গেলেন। ওরা দু'জনে গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল!

একটু পরে হ্যারি বলল, 'তোমার বাবা তোমাকে একা ছেড়ে দিল?'

—মা খুব অসুস্থ।

—ও জানতাম না তো।

—জানো হ্যারি মা'কে কথা দিয়ে ফেলেছি, মা অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যাবো না।

—তুমি শান্ত হয়ে বসে থাকবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।

—উপায় নেই, তাই।

গাড়ী চলল। রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণে খাওয়া-দাওয়া, এ সব নিয়ে কথা হ'ল। এক সময় ফ্রান্সিসদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। ফ্রান্সিস নেমে গেল। নামার সময় বলল, 'হ্যারি মাঝে-মাঝে এসো।'

হ্যারি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ফ্রান্সিস সোজা মা'র ঘরে এসে হাজির হ'ল। মা ওর জন্যেই জেগে ছিল। ঘুমোয় নি তখনও। ফ্রান্সিস মা'র বিছানায় বসল। মা'র একটা হাত ধ'রে বলল, 'মা এখন কেমন আছো'?

—'আমার কথা থাক্। তোদের নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া কেমন হ'ল বল্।'

ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে সে-সব কথা বলতে লাগল। রাজকুমারী মারিয়ার কথাও বলল। পা মচ্‌কানোর বাহানা তুলে নাচের আসর থেকে পালানো, সে-সব কথাও বলল। মা হেসে বলল, 'তোর মাথায় এত দুষ্টুবুদ্ধিও ঝোলে।'

এক সময় ফ্রান্সিস বলল, 'মা, কতকিছু নিয়ে, এলাম তুমি কিছুই দেখলে না।'

—'তুই মঙ্গলমত বাড়ি ফিরেছিস্, এই আমার যথেষ্ট।'

—'দাঁড়াও, তুমি ভালো হ'য়ে ওঠ। তোমাকে রাজার যাদুঘরে নিয়ে যাবো। সব দেখাবো তোমাকে।'

—'সে দেখা যাবে'খন। এবার যা, রাত হ'ল।'

ফ্রান্সিস নিজের ঘরে এল পোষাক-টোষাক ছেড়ে যখন শুয়ে পড়ল, তখন রাত হয়েছে। ও শুয়ে-শুয়ে নানা কথা ভাবতে লাগল। মা সুস্থ হ'য়ে উঠলেই আবার বেরিয়ে পড়বো। এবার কোনদিকে দেখা যাক, মূল্যবান কিছুর খোঁজ পাওয়া যায় কিনা! এক সময় এ-সব ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

পরদিন জাহাজ ঘাটায় হাজার-হাজার লোকের ভীড় জমে গেল। সকলেই মুক্তো দেখতে চায়। মুক্তো-ভরা বাক্সটা নিয়ে মিছিল বেরোবে। ফ্রান্সিসের অনুরোধে বিস্কোই সমস্ত দায়িত্ব নিল। একটা কালো গাড়ি। নানা সোনালী-রুপালী কাজ করা তাতে।

সেই গাড়িটার মাঝখানে একটা বেদীমত করা হ'য়েছে। গাঢ় নীল রঙের ভেল-ভেটের কাপড় মোড়া হ'য়েছে সেটা। তারই ওপর আটটা গর্তমতো করা হ'য়েছে আট'টা মুক্তো রাখা হ'য়েছে তাতে। বাকী মুক্তোগুলি রাখা হ'য়েছে। বেদীর ভেতরে। বিঙ্কো রইলো সেই গাড়ীতে। সঙ্গে দু'-তিনজন বন্ধু। গাড়ির সামনে ও পেছনে ঝালর দেওয়া সবুজ পোষাক পরা সুসজ্জিত দুই দল অশ্বারোহী সৈন্য। জাহাজঘাটা থেকে মিছিল শুরু হ'ল। হাজার-হাজার ফ্রান্সিস ও রাজার নামে জয়ধ্বনি দিল। মিছিল এগিয়ে চলল প্রধান রাজপথ দিয়ে। সবাই যাতে মুক্তো-গুলো ভালভাবে দেখতে পায়, তার জন্যে বিঙ্কো আর তার বন্ধুরা মাঝে-মাঝে বেদী থেকে মুক্তো তুলে হাত উঁচু ক'রে দেখাতে লাগলো।

দর্শকরা তো বিস্ময়ে হতবাক। এতবড় মুক্তো? মিছিল চললো। সারা শহরের লোক যেন ভেঙ্গে পড়েছে রাস্তায়। শহরবাসীরা যেন মেতে উঠলো।

সারা শহর ঘুরে একসময় মিছিলটা শেষ হ'ল রাজপ্রাসাদের সামনের চত্বরে মুক্তো-সুদ্ধ বেদীটা আর বাকী সব মুক্তোগুলো রাখা হ'ল রাজার যাদুঘরে। এই যাদুঘরেই রাখা আছে 'সোনার ঘণ্টা' আর 'হীরের চাঁই' দু'টো। স্থির হ'ল, পরদিন থেকে যাদুঘর উন্মুক্ত ক'রে দেওয়া হবে জনসাধারণের জন্যে। রাজার ফরমাস অনুযায়ী দু'দিনব্যাপী সারা রাজ্যে আনন্দ উৎসব চলল।

দেশবাসী তাতে মেতে উঠল। চলল খাওয়া-দাওয়া হৈ-হল্লা।

ফ্রান্সিস আর বাড়ি থেকে বিশেষ বেরোয় না। মন্ত্রীমশাইও ওর জন্যে পাহারাদার বসায় নি। একঘেয়ে দিন কাটতে লাগল ফ্রান্সিসের। মা মাসখানেকের মধ্যেই সুস্থ হ'য়ে উঠল। এখন হাঁটাচলা, সংসারের সব কাজকর্ম করে। ফ্রান্সিস আর তার বাবা দু'জনেই নিশ্চিন্ত হলেন। ফ্রান্সিস সময় কাটাবার জন্যে কী করবে ভেবে পায় না। কখনও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ছক্কা-পাঞ্জা খেলে, নয়তো বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে। হ্যারি, বিঙ্কো আর অন্যান্য বন্ধুরা অনেকেই আসে। গল্প-গুজব হয়। তবু ফ্রান্সিসের একঘেঁয়েমি কাটতে চায় না।

কিছুদিন কাটলো। একদিন সকালে রাজার একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ফ্রান্সিসের বাড়ির সামনে। কোচ্‌ম্যান বাড়ির ভেতরে এল। সঙ্গে একটা চিঠি। ফ্রান্সিস বাইরের ঘরে এসে ওর কাছ থেকে চিঠিটা নিল। রাজা লিখেছেন—

'স্নেহের ফ্রান্সিস,

পত্রপাঠ আমার সঙ্গে দেখা কর। বিশেষ প্রয়োজন'।

আর কিছুই লেখেন নি রাজামশাই। ফ্রান্সিসও ভেবে পেল না, কী এমন প্রয়োজন পড়ল যে, রাজা একেবারে গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস ভালো পোষাক-টোষাক পরে তৈরী হয়ে নিয়ে গাড়ি চেপে চলল রাজামশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। রাজপ্রাসাদের সামনের চত্বরে এসে গাড়ি দাঁড়াতেই একজন প্রাসাদরক্ষী এগিয়ে এল। মাথা নুইয়ে ফ্রান্সিসকে সম্মান জানিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'মহানুভব রাজা আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

ফ্রান্সিস ওর পেছনে পেছনে চলল। সুসজ্জিত কয়েকটা ঘর পেরিয়ে রাজবাড়ির ভেতরে একটা পুকুরের ধারে এল। পুকুরটার চারধার শ্বেতপাথরে বাঁধানো। পরি-

স্কার নীল জল তাতে। অনেক মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত রঙের কত রকমের মাছ। তারপরেই একটা বাগানমত। এলাকাটা রাজার নিজস্ব চিড়িয়াখানা। বাঘ, ময়ূর, সাপের খাঁচা পেরিয়ে দেখল, রাজামশাই একটা নতুন খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন খাঁচাটায় একটা মেরুদেশীয় শ্বেত ভল্লুকের বাচ্চা। রাজা ভালুকটাকে গমের দানা খাওয়াচ্ছেন, আর পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলছেন।

ফ্রান্সিস রাজার সামনে গিয়ে অভিবাদন করে দাঁড়াল। রাজা এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের কাঁধে হাত রেখে পাশের ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছে ফ্রান্সিস, আমাদের ভাইকিং জাতির গর্ব।'

ফ্রান্সিস এত উচ্চ প্রশংসায় বেশ বিব্রত বোধ করল। এবার পাশের ভদ্রলোককে দেখিয়ে রাজা বললেন, 'ইনি হচ্ছেন এনর সোক্কাসন। দক্ষিণ গ্রীনল্যাণ্ডের রাজা। একটা জরুরী ব্যাপারে উনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানালো। ভালো করে দেখলো রাজা এনর সোক্কাসনকে। বিশাল দেহ রাজার, মুখে দাড়ি গোঁফ। পরণে ছাইরঙের গরম কাপড়ের আলখাল্লার মত। গলায় সোনার মোটা চেন, হীরা-বসানো লকেট তা'তে। কোমরবন্ধনীটাও সোনার মোটা চেন-এর। মাথায় সীলমাছের চামড়ায় তৈরী টুপী। সোক্কাসন হাত দুটো ঘষে নিয়ে বললেন, 'চলুন কোথাও বসা যাক'—

পুকুরের ধারে শ্বেতপাথরের বেদী রয়েছে। ফ্রান্সিস একটা বেদী দেখিয়ে বলল, 'ওখানে বসা যেতে পারে।'

দু'জনে যখন যাচ্ছে ওদিকে, তখন ভাইকিংদের রাজা বললেন, 'ফ্রান্সিস এই মেরু-ভল্লুকটা রাজা সোক্কাসন আমাকে উপহার দিয়েছেন।'

ফ্রান্সিস সোক্কাসনকে জিজ্ঞেস করলো, 'মেরুভল্লুক কি মাংসাশী?'

সোক্কাসন বললেন, 'হ্যাঁ, ওখানে তো ঘাস-পাছপালা বলে কিছু নেই। বরফের-জলের মাছ-টাছ খায়।'

দু'জনে বেদীতে বসল। সোক্কাসন বললেন, 'এখানকার যাদুঘরে আপনার আনা সোনার ঘণ্টা, হীরে, মুক্তো দেখেছি। আপনার দুঃসাহসের প্রশংসা শুনেছি।'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না। সোক্কাসন বলতে লাগলেন, 'আসল কথায় আসি। আপনি নিশ্চয়ই এরিক দ্য রেডের নাম শুনেছেন?'

—'হ্যাঁ উনি তো গ্রীনল্যাণ্ডের প্রবাদপুরুষ। তাঁকে নিয়ে গল্প প্রচলিত আছে'।

—'আমরা তাঁরই বংশধর। এরিক দ্য রেডই ওখানে প্রথম য়ুরোপীয়দের বসতি স্থাপন করেন। তার আগে ওখানে ল্যাপ্ এস্কিমোরা বাস করত। উত্তরের দিকে আর এক উপজাতি বাস করতো এবং এখনও বাস করে। তাদের বলে ইউনিপেড। এরা অসভ্য-বর্বর-হিংস্র। এদের রাজার নাম এ্যাডাল্ডাসন।' সোক্কাসন একটু থামলেন, তারপর বলতে লাগলেন, 'এখন এরিক দ্য রেড ওদিক আলাস্কা, এদিক আইসল্যাণ্ড, নরওয়ের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া কিছু পথ-হারানো জাহাজ, তার মধ্যে জলদস্যুদের জাহাজও তাঁর অধিকারে এসেছিল। এই ধনসম্পত্তি তিনি যে সবটাই সৎপথে উপার্জন করেছিলেন তা নয়। যা হোক, আমার দেশের রাজধানীর নাম 'বাট্টাহালিড'। সেখানে আমার প্রাসাদ আছে।' একটু থেমে

হেসে বললেন, 'এখানকার প্রাসাদের মত নয় কিন্তু, খুবই সাধারণ। এরিক দ্য রেডের আমলে ওটা তৈরী হয়েছিল। তা ছাড়া বড় গীর্জা আছে একটা। এখন সমস্যা দাঁড়িয়েছে, এরিক দ্য রেডের খামখেয়ালীপনার জন্যে। উনি তাঁর উপার্জিত ধনভাণ্ডার যে কোথায় রেখে গেছেন, সেটা আজও রহস্যময়'।

—'উনি কি সেটা বলে যান নি।'—ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো।

—'না। কারণ চিরশত্রু ইউনিপেডদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি হঠাৎ মারা যান। কাজেই স্ত্রী-পুত্র বা মন্ত্রী কাউকেই গুপ্ত-ধনভাণ্ডারের কথা বলে যেতে পারেন নি। এই নিয়ে আমার দেশে অনেক লোককাহিনী প্রচলিত আছে।'

—'আচ্ছা, উনি গীর্জা তৈরী করিয়েছিলেন ?'

—'হ্যাঁ, এবং বেশ যত্নের সঙ্গেই সেটা তৈরী করিয়েছিলেন।'

—'তাহ'লে খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি ছিল।'

—'তা ছিল।'

—'তাঁর ব্যবহৃত কী-কী জিনিস আপনাদের কাছে আছে ?'

—'অস্ত্রশস্ত্র, কিছু পোষাক আর নরওয়ের ভাষায় অনুদিত বাইবেল।'

—'উনি কি নিজেই অনুবাদ করেছিলেন ?

—'হ্যা, আমাদের তাই বিশ্বাস।'

—,হুঁ।' ফ্রান্সিস একটু থেকে ভাবল। তারপর বলল, 'ঐ গুপ্তধন কোথায় আছে বলে আপনাদের ধারণা ?

—'রাজপ্রাসাদের গীর্জায় অথবা সুক্কারটপ পাহাড়ে নীচে কোথাও।'

—'আপনারা ভালোভাবে খুঁজে দেখেছেন ?

—'কয়েকপুরুষ ধরেই খোঁজাখুঁজি চলছে। কিন্তু কেউ কোন হদিস করতে পারে নি'।

—'এবার রাজা সোক্কাসন, বলুন আমাকে কী বলতে চান' ?

সোক্কাসন একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। দাড়িতে হাত বুলোলেন। তারপর বললেন, 'দেখুন, ভেবে দেখলাম আপনি শুধু দুঃসাহসীই নন, বুদ্ধিমানও। আপনিই পারবেন, ঐ গুপ্তধনের হদিস বার করতে। দেশের রাজা হিসেবে, আপনাকে আমাদের দেশে যাবার সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।'

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আপনার আমন্ত্রণে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত। কিন্তু আমার মা এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। কাজেই এখনই আমি কিছু বলতে পারছি না।'

—'ঠিক আছে, আপনি সময়-সুযোগমত যাবেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন।' সোক্কাসন বললেন।

—'ফ্রান্সিস সব শুনলে' ? ভাইকিংদের রাজা এগিয়ে এলেন।

দুজনেই উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল, হ্যাঁ মহারাজ !'

—'কী ? এরিক দ্য রেডের ধন-ভাণ্ডার খুঁজে বের করতে পারবে' ? রাজা মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

—'বাট্টাহালিডে আগে যাই, সব দেখে-শুনে তবেই বলতে পারবো।

রাজামশাই একটু আমতা-আমতা ক'রে বললেন, 'ইয়ে—দেখো—আমি তোমাকেই এই কাজের উপযুক্ত ব'লে মনে করি। তবে তোমাকে কিন্তু তোমার বাবা-মার সম্মতি নিয়ে যেতে হবে'।

—'বেশ।'

ফ্রান্সিস সোক্কাসনকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কবে দেশে ফিরছেন?

—'দু-তিনদিনের মধ্যেই।'

—'আচ্ছা, তা'হলে চলি।' ফ্রান্সিস দু'জনকেই মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকের দিকে পা বাড়াল। রাজার গাড়ি ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। গাড়িতে চড়ে ও বাড়ির দিকে এল। মাঝপথে এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের কথা ভাবতে-ভাবতে এল। ফ্রান্সিসের একঘেঁয়ে দিন কাটতে লাগল। বন্ধুরা আসে, গল্পগুজব হয়। ওরা চলে গেলে ফ্রান্সিস আবার একা। সময় পেলেই অবশ্য মা'র বিছানায়, মা'র পাশে এসে বসে। মা'কে তার আমদাদ নগর, চাঁদের দ্বীপ, আফ্রিকার বন-জঙ্গল এসব গল্প শোনায়। ছাড়া-ছাড়া ভাবে বলে, মা তাই শোনে। মা'র ভাবতেও অবাক লাগে, পৃথিবীতে এমন সব মানুষেরা আছে, এমন সব দেশ আছে। গল্প করার সময়ই ও একদিন বলল, 'মা, তুমি কি আর কোথাও যেতে দেবে না?'

—'না।' মা শান্তস্বরেই বলল, 'অনেক হয়েছে, এবার সংসার করো।'

ফ্রান্সিস বুঝল, মা'কে রাজী করানো খুব মুশ্কিল হবে। ও মা'র কাছে রাজা সোক্কাসনের গল্প করলো, কিন্তু তিনি যে ওকে গ্রীনল্যাণ্ডে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এসব কিছু বলল না।

কথায়-কথায় হ্যারিকে একদিন এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন, আর রাজা সোক্কাসনের আমন্ত্রণের কথা বলল। হ্যারি সব শুনে একটু ভাবল। তারপর বলল, 'তুমি ওখানে গেলে, তোমাকে ওরা রাজার হালে রাখবে সন্দেহ নেই, কিন্তু পারবে কি গুপ্তধন খুঁজে বের করতে?'

—'সেটা বাট্টাহালিডে না গিয়ে তো বলতে পারছি না।'

—'তোমার বাবা-মা যেতে দেবেন?'

—'না দেন তো আবার জাহাজ চুরি করে ওদেশে যাবো।'

আস্তে-আস্তে বন্ধুরাও শুনল, রাজা সোক্কাসনের আমন্ত্রণ, এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের কথা। ওরা তো ফ্রান্সিসকে উত্যক্ত করলো, 'চলো, আবার ভেসে পড়ি'।

ফ্রান্সিস হাসে আর বলে, 'হবে-হবে, সময় আসুক।'

* * *

মা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আবার সংসারের সব ভার কাঁধে তুলে নিয়েছে। ফ্রান্সিস মা'র সঙ্গে বাগান দেখাশুনা করে। অনেক নতুন ফুলের চারা লাগিয়েছে। কয়েকটা ফলের গাছও লাগিয়েছে। বাগানটা যেন আবার শ্রী ফিরে পেয়েছে।

একদিন দুপুরে বাবা ফ্রান্সিসকে তাঁর নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। এ-সময়টা বাবা রাজবাড়িতেই থাকেন। আজকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন। ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকতেই বাবা বললেন, 'বসো, কথা আছে।'

ফ্রান্সিস আসনপাতা কাঠের চেয়ারটায় বসল।

একটু কেশে নিয়ে বাবা বললেন, 'রাজামশাই আমাকে সব কথা বলেছেন। বাট্টাহালিড থেকে রাজা সোক্কাসন চিঠি পাঠিয়েছেন। তুমি কবে নাগাদ যেতে পারবে, জানতে চেয়েছেন।'

ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না।

—'তোমার কী ইচ্ছে ?'

—'বাবা তুমি তো জানো, গৃহবন্দী জীবন আমার অসহ্য।'

—'হুঁ।'

—'তোমরা অনুমতি দিলেই আমি যাবো। মা'র শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তা'ছাড়া গ্রীনল্যান্ড এমন কিছু দূরের দেশ না। যাচ্ছিও রাজার অতিথি হয়ে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'দেখি তোমার মা কী বলেন ?'

ফ্রান্সিস আর মা'কে কিছু বলল না। কিন্তু বাবার কাছ থেকে মা সবকিছুই জানলো। সেদিন মার ঘরে ঢুকতেই মা বলল, 'হ্যাঁরে, তুই নাকি গ্রীনল্যান্ড যাবি ঠিক করেছিস ?'

—'কী করবো বলো, ঘরে বসে থাকতে-থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি।'

—'তাই বলে আবার ঘরবাড়ি ছেড়ে, অজানা-অচেনা দেশে—না-না।'

—'বুঝছো না কেন—' ফ্রান্সিস মা'কে বোঝাতে লাগলো, 'রাজা সোক্কাসনের অতিথি হয়ে আমি যাচ্ছি। দেশটা এমন কিছু দূরেও না।'

—'তবু বিপদ-আপদের কথা কি কিছু বলা যায় ?'

—'তাই যদি বলো মা, তা'হলে তো এক্ষুণি ভূমিকম্প হতে পারে, তখন কোথায় থাকবে তুমি, আর কোথায় থাকবো আমি।'

—'অমন অলুক্ষুণে কথা বলিস নে।' মা বলল।

—'ঠিক আছে, আজই চলো রাজার যাদুঘর দেখতে।'

—'কেন ?'

—'কত দূর-দূর দেশ থেকে আমরা কী এনেছি তোমাকে দেখাবো।'

—'সে তো সব শুনেছি।'

—'শুধু শুনছো, আজকে নিজের চোখে দেখবে, চলো।'

কিছুক্ষণের মধ্যে মা তৈরী হয়ে নিলা। ফ্রান্সিসও তৈরী হয়ে মা'কে ডাকতে এলো। আজকে ও খুব খুশী। মা তো সোনার ঘণ্টা, হীরে, মুক্তো এসব দেখে নি। আজকে দেখবে।

ওদের গাড়ি চললো। অনেকদিন পরে বাইরে বেরিয়ে মা'র ভালোই লাগছিল। যাদুঘরের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। ফ্রান্সিস মা'কে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামালো। যাদুঘরের দরজায় দু'জন ভাইকিং সৈন্য খোলা তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছিলো। দু'জনেই ফ্রান্সিসকে চিনতে পেরে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো।

প্রথম ঘরটাতে রাখা ছিল 'সোনার ঘণ্টা'টা। মা তো সোনার ঘণ্টা দেখে হতবাক। এতবড়ো ঘণ্টা, তাও নিরেট সোনায় তৈরী। মা বিশ্বাস করতে চাইল না। ফ্রান্সিস হেসে বলল, 'হাত দিয়ে দেখো।'

মা ঘণ্টাটার গায়ে হাত বুলোতে লাগলো। মা'র তখনও বিস্ময়ের ভাব কাটে নি।

বলল, 'তোরা এটা এনেছিস ?'

—'হ্যাঁ।' ফ্রান্সিস বলল, 'চলো মা পাশের ঘরে।'

পাশের ঘরে রাখা হয়েছে হীরের টুকরো দু'টো। আবার মা'র অবাক হবার পালা। এত বড়ো হীরে ? মা'র সংশয় তবু যেতে চায় না। বলল, 'এই সবটাই হীরে ?'

ফ্রান্সিস হাসলো, 'হ্যাঁ-মা।'

পরের ঘরটায় গেল ওরা। একটা উঁচু বেদীমত করা হয়েছে সেখানে। গাঢ় বেগুনী রঙের ভেলভেট কাপড়ে ঢাকা। তা'তে মুক্তোগুলো রাখা হয়েছে। এত বড়ো-বড়ো মুক্তো ? মা'র মুখে আর কথা নেই। পাশেই রাখা হয়েছে লা ব্রুশের লুঠ করা মোহর অলঙ্কার ভর্তি বাক্স দু'টো। ফ্রান্সিস বলল, 'মা তোমাকে তো লা ব্রুশের গল্প বলেছি। এ-সব হচ্ছে ঐ কুখ্যাত খুনী জলদস্যুটার সম্পত্তি।'

মা অবাক হয়ে দেখতে লাগল। কত মোহর, কত অলঙ্কার। ফ্রান্সিস বলল, 'মা, তুমি এই থেকে একটা অলঙ্কার নেবে ?'

—'না।' মা দৃঢ়স্বরে বলল, 'কত নিরীহ মানুষের রক্তে ভেজা এ-সব অলঙ্কার। এসব পরলে অমঙ্গল হয়।'

ফ্রান্সিস বুঝলো, মা'কে অলঙ্কার নিতে রাজী করানো যাবে না। মা আর একবার সব ঘুরে-ঘুরে দেখল। তারপর গাড়িতে এসে উঠলো। মা'র তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। গাড়ি চললো। ফ্রান্সিস একসময় হেসে বলল, 'এবার বিশ্বাস হলো তো ?'

—'হুঁ।' মা আর কোনো কথা বলল না।

—'এবার বুঝলে তো, তোমার ছেলে কতটা সাহস আর বুদ্ধি রাখে।'

—'আমার বুঝে দরকার নেই। তুই আমার চোখে থাক্, তা'হলেই হবে।'

ফ্রান্সিস একটু চুপ করে রইল ; তারপর মৃদুস্বরে ডাকল, 'মা।'

—'বল্।'

—'তাহ'লে এবার আমাকে গ্রীনল্যাণ্ডে যেতে দেবে তো ?'

—'আবার ?'

—'রাজা সোক্কাসনের অতিথি হয়ে যাচ্ছি। ভয়ের কিছু নেই।'

—'ক'দিনের মধ্যে ফিরবি ?'

—'ক'দিন আর ?' ফ্রান্সিস মা'কে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে বললো, 'মাস দু'য়েক।' একটু থেমে বলল, 'মা তুমি রাজী হলেই বাবা আর আপত্তি করবেন না।'

—'দেখি তোর বাবার সঙ্গে কথা বলে।' মা বলল। খুশীতে ফ্রান্সিস মা'কে জড়িয়ে ধরলো।

মা মৃদু হেসে বলল, 'ছাড়্-ছাড়্, পাগল ছেলে।'

ক'দিন পরে রাজবাড়ি থেকে গাড়ি এলো। কোচম্যান ফ্রান্সিসকে রাজকুমারীর চিঠি দিলো। চিঠিতে শুধু লেখা—

'আপনার মুক্তো আনার গল্পটা শুনবো। অবশ্যই আসবেন।

—মারিয়া।'

মা ফ্রান্সিসকে সাজিয়ে গুজিয়ে দিল। সে রাজপরিবারের গাড়ি চড়ে রাজবাড়িতে চললো।

অন্দরমহলে একজন পরিচারিকা ওকে একটা ঘরে বসালো। কী সুন্দর সাজসজ্জা সেই ঘরের। দেয়ালে লাল-হলুদ পাথর বসানো। নানা রঙের মোজাইকের কাজ করা মেঝে। জানালায় রঙীন কাঁচ। তারমধ্যে দিয়ে সূর্যের আলো নানা রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘরটাতে। মারিয়া ঘরে ঢুকলো। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়ালো, মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। একটা হাল্কা সবুজ রঙের গাউন পরেছে মারিয়া। মাথায় সোনালী চুল বিনুনী বাঁধা। কী সুন্দর যে লাগছে দেখতে। ফ্রান্সিস কথা বলবে কি, ও যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে ডুবে গেল।

—'খেয়ে নিন আগে।'

মারিয়ার কথায় ফ্রান্সিস যেন সম্বিত ফিরে পেল। দেখলো, একজন পরিচারিকা শ্বেতপাথরের গ্লাসে সরবৎ এনেছে, সঙ্গে একথোকা আঙ্গুর। ফ্রান্সিস সুগন্ধি সরবৎটা একচুমুকেই খেয়ে নিল। তারপর আঙ্গুর খেতে-খেতে মুক্তোর সমুদ্রের গল্প বলতে লাগলো। মারিয়া গালে হাত দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে সেই গল্প শুনতে লাগলো। গল্প সবটা সেদিন শেষ হলো না। আর একদিন আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফ্রান্সিস সেদিন বাড়ি চলে এলো।

আবার একদিন মারিয়ার চিঠি নিয়ে রাজপরিবারের সেই কালো চকচকে কাঠে সোনালী-রুপালী কাজ করা গাড়িটা এলো। সেদিনও সরবৎ, আপেল খাওয়ার পর ফ্রান্সিস মুক্তোর সমুদ্রের গল্পটা বলতে লাগল, জলের নীচে নেমে দেখি একটা নরম নীলচে আলো। মেঝের মতো তলায় কত মুক্তো ছড়ানো। সেই আলো আসছে ছড়ানো মুক্তোগুলো থেকে। সে এক অপার্থিব দৃশ্য। অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখছি, হঠাৎ গা ঘেঁষে চলে গেলো কুৎসিত-মুখো একটা লাফ্ মাছ।'

ফ্রান্সিস গল্প বলছে, আর মারিয়া অবাক হয়ে শুনতে লাগলো, সেই গল্প। একসময় গল্প শেষ হলো, মারিয়ার বিস্ময়তার ঘোর তখনও কাটে নি।

একটু চুপ করে থেকে মারিয়া বলল, 'আপনি এতো কান্ড করেছেন?'

ফ্রান্সিস সলজ্জ হাসলো। মারিয়া বলল, 'এবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

—'এবার বরফের দেশ গ্রীণল্যাণ্ডে যাবো।'

—'সব ঠিক হয়ে গেছে?'

—'উঁহু, বাবার সম্মতির অপেক্ষায় আছি।'

—'গ্রীণল্যাণ্ডে যাচ্ছেন কেন?'

—'এরিক দ্য রেডের নাম শুনেছেন তো?'

—'হ্যাঁ, উনি তো ওখানকার প্রবাদ-পুরুষ ছিলেন।'

—'হ্যাঁ, তাঁরই গুপ্তধন উদ্ধার করতে।' ফ্রান্সিস বলল।

* * *

কয়েকদিন কেটে গেল। সেদিন ফ্রান্সিসের বাবা তাড়াতাড়ি রাজবাড়ি থেকে ফিরলেন। ফিরেই ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠালেন। ফ্রান্সিস বাবার ঘরে গেল। মন্ত্রীমশাই টেবিলে মুখ নীচু করে কিছু লিখছিলেন। ফ্রান্সিস ডাকল, 'বাবা!'

মন্ত্রীমশাই মুখ তুললেন। বললেন, 'তুমি কি রাজা সোক্রাসনের দেশে যেতে চাও?'

—'হ্যাঁ, বাবা। এই অলস-নিষ্কর্মার জীবন আমার ভালো লাগে না।'

—'হুঁ। তোমার মা তোমার এই যাওয়ার ব্যাপারে, সমস্ত দায়িত্বটাই আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে।'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

—'রাজমশাইও আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন, আমি যেন সম্মতি দিই।' একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'সবদিক ভেবে আমি সম্মতি দিলাম।'

ফ্রান্সিস ভেবেই রেখেছিলো, বাবা কিছুতেই রাজী হবেন না। কিন্তু এভাবে এক কথায় বাবাকে রাজী হতে দেখে তার মন আনন্দে নেচে উঠলো। ইচ্ছে হলো, ছুটে বাবাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু বাবার সঙ্গে ও-রকম ব্যবহারে সে অভ্যস্ত নয়। হেসে বলল, 'মা'কে বলে আসি?'

—'যাও। কিন্তু একটা কথা, আমি একমাস সময় দিলাম। এক মাসের মধ্যে তুমি চলে আসবে। তার মধ্যে গুপ্তধন উদ্ধার হোক বা না হোক।'

—'বেশ। তবে আমার একটা কথা ছিল।'

—'বলো।'

—'বাট্টাহালিড পেঁছিতেই প্রায় দিন পনেরো-কুড়ি লেগে যাবে। তারপর গুপ্তধন খোঁজা। এত-সব একমাসে হবে?'

—'বেশ আর পনেরো দিন।' মন্ত্রীমশাই বললেন।

—'ঠিক আছে, আমি ওর মধ্যেই ফিরে আসবো।'

—'আমাকে কথা দিচ্ছো কিন্তু।'

—'হ্যাঁ বাবা।' সে বললে।

* * *

দেখতে-দেখতে বাট্টাহালিডে যাওয়ার দিন এসে গেল। ফ্রান্সিস এর মধ্যে হ্যারি ও বিস্কো ছাড়া আরও দশজন বন্ধুকে বেছে নিল।

রাজামশাই সৈন্য দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে আর লোক নিতে রাজী না।

সেদিন সকাল থেকেই জাহাজঘাটায় লোকজনের ভীড় হয়ে গেল। যে জাহাজে ফ্রান্সিসরা যাবে, সেই জাহজটা একেবারে নূতন। কামানও বসানো আছে। রাজামশাই জাহাজটা নিজে দেখে বেছে দিয়েছেন।

একটু বেলা হতেই ফ্রান্সিসরা দল বেঁধে এলো। একটু পরে রাজা-রানী আর মারিয়া এল। সঙ্গে মন্ত্রী, সেনাপতি, অমাত্য আর শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। জাহাজ ঘাটায় একটা সোনালী ঝালর দেওয়া সামিয়ানা টাঙানো হয়েছিলো, নীচে বসবার আসন। রাজা-রানীর সঙ্গে আর সকলে সামিয়ানার নীচে বসলেন। ফ্রান্সিসরা একে-একে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে জাহাজে গিয়ে উঠলো। এবার আর রাতের অন্ধকারে জাহাজ চুরি করে পালানো নয়। দিনেরবেলা স-সম্মানে সকলের উপস্থিতিতে জাহাজে চড়ে যাত্রা করা। সমুদ্রের দিকে মুখ করে দু'বার কামান দাগা হলো। ঘর-ঘর শব্দে নোঙর তোলা হলো। পালগুলো তুলে দেওয়া হলো। আকাশ পরিষ্কার, সমুদ্রও শান্ত। বাতাসের তোড়ে পালগুলো ফুলে উঠলো। জাহাজঘাটা থেকে সকলেই জাহাজটার দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

রাজামশাই রাজা এনর সোক্কাসনকে লেখা একটা শীলমোহর করা চিঠি দিয়েছিলেন

ফ্রান্সিসকে। বেশ যত্ন করে চিঠিটা রেখে দিল। ফ্রান্সিস বুদ্ধি করে সকলকে যত বেশী সম্ভব, গরম কাপড়-চোপড় আনতে বলে দিয়েছিল। গ্রীণল্যাণ্ডের ঠাণ্ডায় ওদের দেশীয় পোষাক চলবে না।

জাহাজ-যাত্রা শুরু হলো। জাহাজ চললো উত্তর-পশ্চিমমুখো। প্রথমে আইসল্যাণ্ডে যাবে। তারপর গ্রীণল্যাণ্ড। দিন-রাত, জাহাজ চলছে। ফ্রান্সিস আর তার বন্ধুরা খুশীতেই আছে। ঝড়-ঝাপটার কবলে পড়েনি ওরা। বেশ নির্বিঘ্ন যাত্রা।

দিন-সাতেক যেতে না যেতেই চারপাশের আবহাওয়ায় পরিবর্তন দেখা গেলো। সূর্যের আলোয় আর সেই তেজ নেই। বেশ ঠাণ্ডা উত্তরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সকালে আর রাত্রে ঘন কুয়াশা পড়ে। তারই মধ্যে পথ করে জাহাজ চলেছে। যতদিন যাচ্ছে আর ঠাণ্ডাও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সবাইকে বেশী-বেশী গরম পোষাক পরতে হচ্ছে, আর কান-ঢাকা টুপী।

হঠাৎ একদিন ওরা সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈল দেখতে পেলো। খুব বড়ো নয়, তবে ওপর থেকে বোঝবার উপায় নেই। কারণ হিমশৈলের বেশীর ভাগটাই থাকে জলের তলায়। যতো এগাচ্ছে জাহাজ, ততোই বিরাট আকারের সব হিমশৈলের সামনে পড়েছে। তাই সারাক্ষণ দু'তিনজন করে নজর রাখছে হিমশৈলের দিকে। কোনভাবে যদি জাহাজটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়, জাহাজ আর আস্ত থাকবে না। তাই দিনরাত সজাগ থাকতে হচ্ছে।

জাহাজ একদিন আইসল্যাণ্ডে পেঁছলো। বন্দরটার নাম রেক্‌হাভিক, ছোট্ট বন্দর। তিনদিকে বিরাট-বিরাট বরফের খাড়া পাহাড়। তারই নীচে খাঁড়ির মধ্যে বন্দরটা। ফ্রান্সিসরা জাহাজ ভেড়ালো সেই বন্দরে। এখানে স্ক্রেলিং উপজাতিদের বাস। ওরা চামড়ার তৈরী তাঁবুতে থাকে। সীলমাছের চামড়ায় তৈরী কায়াক নৌকায় চড়ে এলো ওরা। এই কায়াক নৌকো উলটে গেলেও জলে ডুবে যায় না। পরণে চামড়ার পোষাক, মাথার টুপীও চামড়ার। দলে-দলে ওরা নৌকা চড়ে এলো। ফ্রান্সিস প্রথমেই ওদের সঙ্গে শত্রুতা করল না। ওরা জাহাজে উঠতে চাইলে, উঠতে দিল। ঐ স্ক্রেলিংদের মধ্যে থেকে সর্দারগোছের একজন এগিয়ে এলো ফ্রান্সিসদের দিকে। ভাঙা-ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বলল, রঙীন কাপড় আছে কিনা। ফ্রান্সিসদের কাছে লাল-নীল নানা রঙের কাপড় ছিল। সে-সব ওদের দেওয়া হলো, দেখা গেল ওরা খুব খুশী। সেইসব কাপড় ছিঁড়ে-ছিঁড়ে মাথায় বাঁধতে লাগলো। সর্দার কী যেন বলে উঠলো। কয়েকজন জাহাজ থেকে নেমে নৌকো থেকে নিয়ে এলো মেরুদেশের ভল্লুক আর বল্‌গা হরিণের দামী দামী চামড়া। ফ্রান্সিসরাও ওসব পেয়ে খুব খুশী। স্ক্রেলিংরা দল বেঁধে হৈ-হৈ করতে-করতে মাথায় ছিট-কাপড়ের ফেট্টি বেঁধে নৌকায় চড়ে চলে গেলো। কোনো ঝামেলা না হতে দেখে ফ্রান্সিসরা খুশী হলো। সেই রাতটা ওরা রেকহাভিক বন্দরেই রইলো।

পরদিন আবার যাত্রা শুরু হলো। আইসল্যাণ্ডের তীরভূমির কাছ দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে। তখনই দেখলো সীল মাছ আর সিন্ধুঘোটকের দল। ওগুলো কখনো জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আবার উঠছে বরফের তীরে। এইভাবে ওগুলো ছোট-ছোট মাছ ধরে

খাচ্ছে। আবার এক দঙ্গল সিন্ধুঘোটককে দেখলো, চুপচাপ শুয়ে-শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে। গোঁফদাড়ি আর বড়-বড় দু'টো দাঁতওলা সিন্ধুঘোটকগুলো এমনিতে শান্ত। বরফ-গলা হিমজলে ওদের কোনো অস্বস্তিই নেই।

একদিন পরেই ফ্রান্সিসদের জাহাজ আইসল্যাণ্ডের আর একটা বন্দর হোলটাভান-সসের কাছাকাছি। উঁচু-উঁচু পাহাড়ের মত বরফের চাঁই, তারই নীচে বন্দর। ওদের ইচ্ছে ছিল বন্দরে জাহাজ ভেড়ানোর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারল না। তখন বিকেল, এমনিতেই এসব অঞ্চলে সূর্যালোকে বেশীক্ষণ থাকে না। তাছাড়া কুয়াশা তো রয়েইছে। সেই আবছা-অন্ধকারে ফ্রান্সিসরা দেখলো, ল্যাপ্‌জাতীয় আদিবাসীরা অনেকগুলো কায়াক নৌকোয় চড়ে, ওদের জাহাজ লক্ষ্য ক'রে আসছে। ল্যাপ্‌দের হাতে কুঠার আর তীরধনুক। হঠাৎ ঝাঁকে-ঝাঁকে তীর এসে ওদের জাহাজে পড়তে লাগলো, দু'চার জন আহতও হলো। বোঝাই যাচ্ছে, ল্যাপ্‌রা বন্ধুত্ব আসছে না। ওদের উদ্দেশ্য জাহাজ লুঠ করা। ল্যাপ্‌রা মাঝে-মাঝে চীৎকার করে উঠছে, শূন্যে ধারালো কুঠার তুলে আস্ফালন করছে।

ফ্রান্সিস সবাইকে ডেকে বলল, 'এই বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো হবে না।' জাহাজের মুখ ঘোরানো হলো। কিন্তু ল্যাপ্‌রা সেই মাঝে-মাঝে চীৎকার করে উঠছে, আর জাহাজের পিছু ছাড়ছে না দেখে ফ্রান্সিস তখন হুকুম দিল, 'গোলা-ছোঁড়ো।'

গোলন্দাজরা কামানের কাছে জড়ো হলো। ফ্রান্সিস তরোয়াল তুলে ইঙ্গিত করতেই গোলা ছুটলো ল্যাপ্‌দের নৌকো লক্ষ্য করে। কয়েকটা নৌকো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। আবার গোলা ছুটলো, আবার কয়েকটা নৌকো-সুদ্ধু ল্যাপ্‌রা জলে পড়ে গেলো। ওদের মধ্যে থেকে আহতদের আর্তনাদ শোনা গেলো। আর তীর ছুঁড়লো না ওরা, নৌকোগুলো বন্দরের দিকে ফিরে যেতে লাগলো। জাহাজের মুখ ঘোরানো হলো গ্রীনল্যাণ্ডের দিকে। জলে ভাসমান বরফের স্তর এড়িয়ে জাহাজ নিয়ে যেতে হলো। কাজেই জাহাজের গতি ছিল ধীর। প্রায় তিনদিন লেগে গেলো গ্রীনল্যাণ্ডে আসতে। কয়েকদিন পরেই জাহাজ ভিড়লো দক্ষিণ গ্রীনল্যাণ্ডের বন্দরে।

এই বন্দর সমতল জমির ওপর কোনদিকে উঁচু পাহাড়ের মত বরফের চাঁই নেই। এই বন্দরটা একটু বড়ো। বন্দরের ধারে-ধারে এস্কিমোদের চামড়ার তাঁবুর বসতি। এই প্রথম ফ্রান্সিসরা এস্কিমোদের দেখলো। বন্দরে আরো দু'তিনটি জাহাজ ছিল। ওরা জাহাজ থেকে দল বেঁধে নেমে এলো। কিন্তু ঠাণ্ডায় যেন সমস্ত শরীর জমে যাচ্ছে। তবু অনেকদিন পরে মাটিতে পা দেওয়া, তার আনন্দই আলাদা। ভাগ্য ভালো বলতে হবে। কুয়াশা কেটে গিয়ে কিছুটা উজ্জ্বল রোদ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। বরফে পড়ে সেই রোদ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এস্কিমোদের চামড়ার তাঁবুর কাছাকাছি আসতে এস্কিমোরা বেরিয়ে আসতে লাগলো। খুঁটির ওপর দড়ি বেঁধে ওরা ওদের বল্‌গা হরিণের চামড়ায় তৈরী লোমওলা পোষাকগুলো রোদে শুকোতে দিয়েছে। ফ্রান্সিসরা কাছাকাছি আসতে, কয়েকজন এস্কিমো একটা বড়ো তাঁবুর কাছে গিয়ে কাকে ডাকতে লাগলো। একজন মোটাগোছের লোক সেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো। তার পোষাক অন্যান্য এস্কি-

মোদের তুলনায় একটু বেশী পরিচ্ছন্ন। তার মুখে কালো চোঙের মতো কী একটা। তামাক খাচ্ছে বোধহয়, মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। বোঝা গেল, এই লোকটাই এস্কিমোদের সর্দার। সর্দার ফ্রান্সিসদের দেখলো, তারপর তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো। একটু পরেই হাতে কী নিয়ে বেরিয়ে এলো। সেটা একটা ছুরি আর ছুঁচ। ফ্রান্সিসই সবার আগে ছিল। এস্কিমোদের সর্দার ছুরি আর ছুঁচটা ওর হাতে দিয়ে এস্কিমোদের ভাষায় বলল, 'কুয়অনকা।'' কথাটার অর্থ 'তোমাকে ধন্যবাদ'।

ফ্রান্সিস সেটা না বুঝলেও এটা বুঝলো যে, এস্কিমো সর্দার ওদের সঙ্গে বন্ধুত্বই করতে চায়। ফ্রান্সিস বিস্কোকে ডেকে বললো 'বিস্কো জাহাজে যাও, রঙীন কাপড় যা আছে নিয়ে এসো।'

বিস্কো চলে গেলো। ফ্রান্সিস নরওয়ের ভাষায় বলল, 'আমরা বাট্টাহালিডে যাবো। রাজা এনর সোক্কাসন আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমরা তো এই দেশে নতুন এসেছি, কাজেই একজন পথ-প্রদর্শক পেলে খুবই ভালো হয়।'

এস্কিমো-সর্দার এবার ডানহাতের তর্জনী নিজের বুকে ঠেকালো। তারপর বলল, 'কালুটুলা'।

ফ্রান্সিস বুঝলো, ওর নাম কালুটুলা। তারপর ভাঙা-ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বলল, 'তোমরা আমাদের বন্ধু হলে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করবো।'

এর মধ্যে বিস্কো রঙীন কাপড় নিয়ে এলো। ফ্রান্সিস সে-সব কালুটুলার হাতে দিল। কালুটুলা খুব খুশী দেখে অন্যান্য এস্কিমোরাও খুশী হলো। বারবার বলতে লাগলো, 'কুয়অনকা।'

তারপর বলল, 'এখানকার ঠান্ডায় তোমাদের এ পোষাক চলবে না। কয়েকদিন অপেক্ষা করো। তোমাদের চামড়ার পোষাক তৈরী করে দেবো।'

ফ্রান্সিস বলল, 'আপাততঃ আমাদের দু'টো পোশাক তৈরী করে দিলেই হবে।'

কালুটুলা মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল, ও তাই করবে। বাট্টাহালিডে যেতে হলে কীভাবে যেতে হবে, ওদিকে আবহাওয়া কেমন, এসব নিয়ে কিছু কথাবার্তা হলো। তারপর ফ্রান্সিসরা চলে এলো। এস্কিমোরা মেয়ে-পুরুষ সকলেই হাত নেড়ে ফ্রান্সিসদের বিদায় জানালো। গ্রীনল্যান্ডে এসে এস্কিমোদের কাছে এই সাদর অভ্যর্থনা পেয়ে ফ্রান্সিস খুশীই হলো।

* * *

পরের দিন সকালে ফ্রান্সিস আর হ্যারি নেমে এলো জাহাজ থেকে। কালুটুলার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলো। জানতে চাইলো পথ-প্রদর্শক পাওয়া গেছে কিনা? কালুটুলা কাকে যেন ডাকতে পাঠালো। একটু পরেই একজন বেশ বলশালী যুবক তাঁবুতে এলো। পরণে এস্কিমোদের মাথা-কান-ঢাকা লোমের পোষাক।

কালুটুলা বলল—'এর নাম সাঙখু; ভালুক শিকারে ওস্তাদ।'

সাঙখু দাঁত বের ক'রে হাসল। সে অল্প-অল্প নরওয়ের ভাষা বলতে পারে। বলল—'আপনারা কবে যাবেন?'

—'দু' তিনদিনের মধ্যেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছতে হবে।'

—'ঠিক আছে।' কালুটুলা বলল—'আজ রাত্রে আমাদের এখানে নাচের আসর বসবে। আপনারা আসবেন।'

সে রাতে আকাশটা অনেক পরিষ্কার ছিল। কিছু তারাও আকাশে দেখা যাচ্ছিল। চাঁদও। অল্প চাঁদের আলো পড়েছে বরফঢাকা বন্দর এলাকায়। ফ্রান্সিসরা দল বেঁধে চলল এস্কিমোদের তাঁবুগুলোর উদ্দেশ্যে। দূর থেকেই শুনতে পেল কুকুরের ডাক। প্রত্যেক এস্কিমো পরিবারই কুকুর পোষে। কুকুর ওদের নানা কাজে লাগে। কুকুর ওদের শ্লেজগাড়ি চালায়, হারপুন দিয়ে শিকার করা, সীল অথবা সিন্ধুঘোটক কুকুরই কামড়ে ধ'রে নিয়ে আসে। কুকুরগুলোর গায়ে খুব ঘন লোম। তাঁবুর বাইরেই কুকুরগুলো থাকে। তুষার পড়লে, তুষার একেবারে ঢাকা পড়ে যায়। কী ক'রে তারই মধ্যে ফুটো করে শ্বাস নেয়, ঘুমোয়। ডাকলেই তুষার ঝেড়ে ফেলে উঠে বসে।

ওরা এস্কিমোদের বসতিতে পৌঁছে দেখল—একটা জায়গা ঘিরে সীলমাছের তেলে চুবোনো মশাল জ্বলছে। সেই আলোগুলোর মাঝখানে নাচের জায়গা। দু'জন এস্কিমো দু'টো ড্রাম নিয়ে এলো। সাঙখু আর ওর সঙ্গীরা নাচের জায়গাটায় দাঁড়াল। ড্রাম বাজনা শুরু হলো। সাঙখু ওরা নানান অঙ্গভঙ্গী ক'রে তালে-তালে নাচতে লাগল। সেই তালে-তালে একজন এস্কিমো বিচিত্র সুরে গান গাইলো। আবার কয়েকজন মুখ দিয়ে শব্দও করতে লাগল।

রাত বাড়তে লাগল। গুঁড়ি-গুঁড়ি মিহি তুষারকণার বৃষ্টি শুরু হ'ল। চাঁদ তারা ঢাকা পড়ে গেল। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল চারিদিক। ফ্রান্সিসরা আর বসলো না! ওরা জাহাজে ফিরে এল।

পরদিন থেকে ফ্রান্সিস আর বসে-বসে সময় কাটাল না। সাঙখুর সঙ্গে এর মধ্যেই ওর বেশ ভাব হ'য়ে গিয়েছিল। ও সাঙখুর কাছে শ্লেজগাড়ি চালানো শিখতে চাইল। সাঙখু খুশীই হলো এই প্রস্তাবে। ও ফ্রান্সিসকে নিয়ে একটা শ্লেজগাড়ির কাছে এল। শিস্ দিয়ে কুকুরগুলোকে ডাকল। দু'পাশে ছ'টা-ছ'টা ক'রে বারোটা কুকুরকে পর-পর লম্বা লাগামের সঙ্গে জুড়লো। দু'জন উঠে বসলো শ্লেজগাড়িটায়। শ্লেজগাড়ির কোন চাকা থাকে না। সব মিলিয়ে গাড়িগুলো লম্বায় প্রায় তের ফুট হয়। চওড়ায় চার ফুট। সাঙখু শিস্ দিয়ে চাবুক চালাল। কুকুরগুলো গাড়ি টেনে নিয়ে ছুটল বরফের ওপর দিয়ে। ফ্রান্সিস অনুমানে বুঝল, গাড়ির গতি নেহাৎ কম নয়। বল্‌গা হরিণ টানলে এর চেয়ে অনেক বেশী গতি হয়। সাঙখু মাঝে-মাঝেই চাবুক চালাচ্ছে। বরফ ভাঙ্গার একটা ছড়্-ছড় শব্দ উঠছে শুধু।

গাড়ি চালাতে-চালাতে সাঙখু বলল—'এই চাবুকই হলো আসল। শুধু একটা কুকুরকে চাবুক মারলে হবে না। সব ক'টা কুকুরকেই একসঙ্গে চাবুক মারতে হবে। আবার চাবুকের শব্দও করতে হবে। চাবুকের চামড়াটা ফিরিয়ে আনতে হবে সাবধানে। অসাবধান হলে লম্বা লাগামে চাবুকের চামড়াটা জড়িয়ে যায়। তখন চালক ছিট্‌কে বরফের মধ্যে পড়ে যায়।'

ফ্রান্সিস বেশ মনোযোগ দিয়ে তার কথাগুলো শুনল। সাঙখু এবার চালকের জায়গাটা ফ্রান্সিসকে ছেড়ে দিলো। ফ্রান্সিস লাগাম ধরে খুব সাবধানে চাবুক চালাতে লাগলো। কুকুরগুলোর মাথার ওপর চাবুকের শব্দও করতে লাগলো। অত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও ওর চাবুকের চামড়াটা লম্বা লাগামের সঙ্গে জড়িয়ে গেলো। ও প্রায়

ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল। সাঙখু মুহূর্তে লাগাম শক্ত হাতে টেনে ধরে গাড়ি থামালো। চাবুকের চামড়াটার জট খুলে আবার গাড়ি ছোটালো সাঙখু। আবার ফ্রান্সিস চালকের জায়গায় বসলো। লাগাম ধরে গাড়ি চালাতে লাগলো। ঘণ্টা কয়েক গাড়ি চালিয়ে ওরা ফিরে এলো।

কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্রান্সিস শ্লেজগাড়ি চালানো শিখে নিলো। ও এবার হ্যারিকে শ্লেজগাড়ি চালানো শেখাতে লাগলো। কিন্তু হ্যারির দিন দুই-তিন চেষ্টা করেও সুবিধে হলো না। ও হাল ছেড়ে দিলো।

এবার ফ্রান্সিস সাঙখুর কাছে শিখতে লাগলো, এস্কিমো আর ল্যাপদের যুদ্ধরীতি। ওরা অস্ত্র হিসাবে তীরধনুক, বর্শা আর চওড়া ফলাওলা কুঠার ব্যবহার করে। তীরধনুক, বর্শা তার কাছে নতুন কিছু নয়, কিন্তু কুঠার চালানোটা নতুন। সাঙখু ঐ অঞ্চলের নামকরা ভালুক শিকারী। সে ফ্রান্সিসকে কুঠার চালানো শেখাতে লাগলো। কুঠার তরোয়ালের মতো হাল্কা নয়, বেশ ভারী। কুঠার ঘোরাতে, আঘাত করতে বেশ দমের দরকার। প্রথম-প্রথম ফ্রান্সিস অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। পরে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেলো। খুব দ্রুত স্থান পরিবর্তন ও কুঠারের আঘাত হানা এসব শিখে গেলো।

এর মধ্যে এস্কিমো-সর্দার কালুটুলা ফ্রান্সিসদের জন্যে দু'টো এস্কিমোদের পোষাক তৈরী করিয়ে দিলো। সিন্ধুঘোটকের চামড়ায় তৈরী সেই মাথা-ঢাকা পোষাক। মুখের দিকে চারপাশে আর পোষাকের হাঁটুর কাছে বল্গা হরিণের লোম দিয়ে কাজ করা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি পোষাক পরলো, কিন্তু ভীষণ শক্ত-শক্ত লাগলো। তখন কালুটুলা পোষাক দু'টোয় ভালো করে সীলমাছের তেল মাখাতে বললো।

তেল মাখাতে পোষাক দু'টো অনেকটা নরম হলো।

এবার যাত্রা শুরু করতে হবে। ফ্রান্সিসের বাবা দেড় মাসের মেয়াদ দিয়েছেন। এর মধ্যেই সব সেরে ফিরতে হবে। এসব জায়গায় আকাশে সূর্য বেশীক্ষণ থাকে না। তাই সব সময়ই একটা আবছা আলো থাকে। সূর্য অস্ত গেলেই একেবারে নিকষ অন্ধকার। কাজেই দিন থাকতেই পথ চলতে হবে।

একদিন সকাল থেকে যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন চললো। যা-যা দরকার পড়তে পারে, সে সবই তোলা হলো শ্লেজ গাড়িটায়—শুকনো সীল মাছ, সিন্ধুঘোটকের মাংস, কাঠ, চকমকি পাথর, সীল মাছের তেল-মাখানো মশাল, কুঠার, বর্শা, তীরধনুক, তরোয়াল, তাঁবু। দু'টো শ্লেজগাড়িতে কুকুরগুলো জুড়ে দেওয়া হলো। একটা শ্লেজগাড়িতে সাঙখু আর হ্যারি থাকবে। অন্যটায় ফ্রান্সিস একা।

জাহাজ থেকে নেমে ফ্রান্সিস আর হ্যারি গাড়ি দু'টোর কাছে এলো। সব দেখে-শুনে নিলো। এবার যাত্রা। সাঙখু, হ্যারি, ফ্রান্সিস সবাই গাড়িতে উঠে বসলো। এস্কিমো সর্দার কালুটুলা আর কিছু এস্কিমো এসে দাঁড়ালো। তখন সকাল, সূর্যের ম্লান আলো পড়েছে দিগন্তব্যাপী বরফ-ঢাকা প্রান্তরে। ফ্রান্সিসদের বন্ধুরা জাহাজ থেকে হাত নেড়ে ওদের বিদায় জানালো। গাড়ি দু'টো ছুটলো তুষার প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে। শ্লেজগাড়ির চাপে বরফ ভাঙার খস্‌খস্ শব্দ শুধু। মাঝে-মাঝে কুকুরের ডাক। প্রথমে ওরা যাবে কোটলেড। সেখানে কিছু এস্কিমোদের বসতি আছে।

সেখান থেকে রাজধানী বাট্টাহালিডে।

গাড়ি দু'টো চললো। চারিদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ। দুপুর নাগাদ একটা জায়গায় থামলো ওরা। খাবার খেলো, বিশ্রাম করলো, তারপর আবার যাত্রা করলো।

সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকার নেমে এলো। তার মধ্যে দিয়েই গাড়ি দু'টো ছুটলো। রাত্রে আর এক জায়গায় বিশ্রাম নিলো। চক্‌মকি ঠুকে মশাল জ্বালিয়ে কাঠ দিয়ে উনুন জ্বালাল। শুকনো মাংস রান্না করে খেলো। তারপর সেই তুষার প্রান্তরে তাঁবু খাটালো। রাতটা কাটালো তাঁবুতে। বাইরের উনুনের আগুন নেভালো না, সারারাত জ্বললো ওটা। আগুনে ওরা হাত-পা সেঁকে নিলো। সাঙখু বললো, আগুন থাকলে শ্বেতভল্লুক, হিংস্র নেকড়ে এসব ধারে-কাছে ঘেঁষবে না।'

পরদিন তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো। আবহাওয়া বেশ ভালই থাকলো, তিনদিন নির্বিঘ্নেই কাটলো। কিন্তু তার পরদিনই আবহাওয়া পরিবর্তন দেখা গেল। হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেলো, হু-হু উত্তুরে হাওয়া ছুটলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো তুষার-ঝড়ের তাণ্ডব। তবে বড় বেশীক্ষণ রইলো না, একটু পরেই তুষার-ঝড় বন্ধ হলো। ওরা তাঁবু খাটিয়ে রাতের মতো বিশ্রাম নিলো।

পরদিন তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হলো। তখন দুপুরের কাছাকাছি সময়। একটা বরফের টিলামত পড়ল। সেটা ঘুরতেই একটা শ্বেত-ভালুকের মুখোমুখি পড়ে গেল ওরা। কুকুরগুলো দাঁড়িয়ে পড়লো, ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে লাগল কুকুরগুলো। শ্বেত-ভালুকটা সামনের দু'পা তুলে আক্রমণের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পড়লো। ফ্রান্সিসের গাড়িটাই সামনে ছিল। সে গাড়ির গায়ে বেঁধে-রাখা কুঠারটা নিয়ে একলাফে নেমে দাঁড়ালো বরফের ওপর। টিলাটার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো, যাতে আক্রান্ত হলে পিছিয়ে আসতে পারে। সাঙখুও কুঠার হাতে নেমে এলো। কুকুরগুলো সামনে ডেকে চলছে।

বিরাট চেহারার ভালুকটা দু'পা তুলে গলায় গর্‌-গর্‌ শব্দ করতে-করতে দুলে-দুলে ছুটে আসতে লাগলো! হাতের ধারালো নখগুলো বেরিয়ে আছে। মুখ হাঁ করা, চক্‌চকে ধারালো দাঁত বেরিয়ে আছে। সাঙখু লাগামের দড়ি থেকে কুকুরগুলোকে খুলে দিতে লাগলো। ছাড়া পেতেই কুকুরগুলো একে-একে ভালুকটার চারপাশে জড়ো হতে লাগলো আর প্রাণপণে ঘেউ-ঘেউ করতে লাগলো। ভালুকটা একবার বিরক্ত হয়ে এ'পাশের কুকুরগুলোকে তাড়ায় তো, ও'পাশের কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। সাঙখু এবার ধীর পায়ে ভালুকটার দিকে এগোতে লাগলো। আর একপাশ থেকে ফ্রান্সিসও এগিয়ে আসতে লাগলো। সাঙখু কুঠারটা এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগলো, আর ঘা-বারবার সুযোগ খুঁজতে লাগলো।

এক সময় ভালুকটা সাঙখুর দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই ফ্রান্সিস ভালুকটার পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর বিদ্যুৎগতিতে কুঠারের কোপ বসালো ভালুকটার পিঠে। ভালুকটা ঘা খেয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে। সাঙখুর হাতে প্রচণ্ড জোরে থাবা মারল। সাঙখুর হাত থেকে কুঠার ছিটকে পড়ে গেল, ও বরফের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে গেল।

ওদিকে ভালুকের পিঠ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। আহত পশুটা ভয়ংকর হয়ে উঠলো। গোঁ-গোঁ শব্দ করতে-করতে ওটা সাঙখুর দিকে ছুটলো।

ফ্রান্সিস চিৎকার করে ডাকল, 'সাঙখু, এই নাও।' বলে ও কুঠারটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল। সে শোয়া অবস্থাতেই কুঠারটা বরফ থেকে তুলে নিলো। তারপর এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো। তখন ভালুকটার সঙ্গে ওর দূরত্ব দু'হাতও নয়। ভালুকটা থাবা মারার জন্য সামনের থাবাটা বাড়ালো। সে আর একমুহূর্তও দেরী করল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড জোরে কুঠার চালালো ভালুকটার মাথা লক্ষ্য করে। দু'চোখের ওপরে কপালে লাগলো ঘা'টা, মাথাটা দুফাঁক হয়ে গেল। প্রচণ্ড গর্জন করে ভালুকটা বরফের ওপর ধপাস্ করে পড়ে গেল। বার কয়েক নড়ে স্থির হয়ে গেল। বরফের ওপর রক্তের ধারা বইলো। সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বরফের ওপর বসে পড়লো!

ফ্রান্সিস ছুটে এলো, দেখলো সাঙখুর ডান হাত থেকে রক্ত পড়ছে। ভালুকটার থাবার নখের আঁচড় লেগেছে। ফ্রান্সিস কাটা জায়গাগুলোতে বরফ ঘষতে লাগলো। একটু পরেই রক্তপড়া বন্ধ হলো। সে এবার উঠে কোমরে ঝোলানো ছুরিটা বের করলো। তারপর মৃত ভালুকটার কাছে গে। নিপুণ হাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে শ্লেজগাড়িতে রাখলো। ফ্রান্সিসও গাড়িতে উঠলো, কুকুরগুলোকে আবার লাগামের সঙ্গে বাঁধা হলো।

আবহাওয়া বেশ ভালই চললো ক'দিন। তিনদিন নির্বিঘ্নেই কাটলো। কিন্তু তার পরদিনই আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা গেল। হঠাৎ সব আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেল। হু-হু করে উত্তুরে হাওয়া গর্জন করে ছুটলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো তুষার-ঝড়ের তাণ্ডব। সে-কী হাওয়ার প্রচন্ডতা, যেন শ্লেজগাড়িটা উলটে ফেলবে। সেইসঙ্গে ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে বরফকুচির প্রচণ্ড ঝাপটা।

দু'চোখ কুঁচকে দৃষ্টি স্থির রেখে, ফ্রান্সিস গাড়ি চালাতে লাগলো। সেই প্রচণ্ড ঝড়ের বেগের মধ্যে গাড়ি চলতে লাগলো শামুকের গতিতে। ফ্রান্সিস কয়েক হাত দূরেও দেখতে পাচ্ছিল না। ঘন কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা, সেইসঙ্গে বরফকুচির ঝাপটা। হঠাৎ একসময় পাশে তাকালো। আবছা অন্ধকারে হ্যারিদের গাড়িটা দেখতে পেল না। ভাবলো ঝড়টা থামুক, তখন খোঁজ করা যাবে।

প্রায় আধঘণ্টা ঝড়ের এই তাণ্ডব চললো। তারপর আস্তে-আস্তে ঝড়ের গর্জন বন্ধ হলো। বরফকুচির ঝাপটা থেকে গেলো। আস্তে-আস্তে চারদিকে ঘন কুয়াশার আবরণ পাতলা হ'তে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো ফুটলো। দিগন্তের দিকে অনুজ্জ্বল সূর্যটাকে দেখা গেলো। ফ্রান্সিস চারিদিকে তাকাতে লাগলো। কিন্তু হ্যারিদের গাড়ি কোনদিকে দেখতে পেল না। যতদূর চোখ যায়, শুধু বরফের শুভ্র প্রান্তর। হ্যারিদের গাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। ফ্রান্সিসের একটু দুশ্চিন্তা হলো। একেবারে একা পড়ে গেলো। অপরিচিত জায়গা। সঙ্গে সাঙখু নেই। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কে? তবু একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলো, যে হ্যারি সাঙখুর সঙ্গে আছে। ফ্রান্সিস সূর্যের দিকে তাকালো। উত্তর দিকটা ঠিক ক'রে নিলো। তারপর গাড়ির মুখ একটু ঘুরিয়ে সোজা উত্তর দিক লক্ষ্য ক'রে গাড়ি চালাতে লাগলো। কোর্টল্ড সোজা উত্তর দিকে।

সূর্য অস্ত যেতেই চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে গেলো। ফ্রান্সিস মাথার ওপর অস্পষ্ট ধ্রুবতারার দিকে দেখলো। ঠিক উত্তরে যাচ্ছেও। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিকের অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে উঠলো। ফ্রান্সিস রাত্রির মত বিশ্রামের জায়গা খুঁজে নিল। তাঁবু খাটাল। মশাল জেলে আগুনে জ্বালাল। সিন্ধুঘোটকের শুকনো মাংস রাঁধলো। কুকুরগুলোকে খেতে দিলো। তারপর নিজে খেয়ে শুয়ে পড়লো। চারিদিকে অসীম নিঃশব্দ। একটু পরেই চাঁদ উঠলো। একটা নরম মৃদু আলো ছড়ানো চারিদিকে। ফ্রান্সিসের অনেক চিন্তা এখন। গাড়িতে খুব বেশীদিনের রসদ নেই। রসদ ফুরোবার আগেই হ্যারিদের গাড়ির খোঁজ পেতে হবে, নয়তো কোর্টল্ড পেঁছিতে হবে। এ-সব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

ভোরবেলা উঠে তাঁবু গুটিয়ে নিলো। কুকুরগুলোকে লম্বা লাগামে বাঁধলো। তারপর গাড়ি ছোটালো। দিগন্তের ওপরে সূর্যকে লক্ষ্য রেখে দিক ঠিক ক'রে দিলো।

এইভাবে তিনদিন কেটে গেল। কিন্তু হ্যারিদের গাড়ির হদিশ পাওয়া গেল না। কোর্টল্ড পৌছানো হ'ল না। ফ্রান্সিস এবার মজুত খাদ্য দেখতে গিয়ে দেখল, আর একদিনের মত খাদ্য আছে। খুব দুশ্চিন্তায় প'ড়ে গেল ফ্রান্সিস। সমুদ্রতীরে পেঁছোতে পারলে সীলমাছ, সিন্ধুঘোটক শিকার ক'রে দিন কাটানো যেত। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বরফের প্রান্তরে খাদ্য জুটবে কোত্থেকে?

সেদিনটা ও উপোস ক'রে রইলো। কিন্তু কুকুরগুলোকে খেতে দিলো। গাড়ি চালু রাখতেই হবে। এখন এই গাড়িই একমাত্র ভরসা।

দু'দিন কাটলো। খাদ্য শেষ ক্ষুধার্ত কুকুরগুলো কত জোরে আর গাড়ি টানবে? গাড়ির গতিও কমে গেলো। দু'দিনের উপবাসী ফ্রান্সিস কোনরকমে লাগাম ধ'রে বসে রইল। গতি চলল ঢিমেতালে।

সেদিন একটা বড় বরফের চাঙ্‌ড়ার পাশটা ঘুরতেই চোখের পলকে একটা নেকড়ে বাঘ কুকুরগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কুকুরগুলো ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেল। সেই সঙ্গে ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডাকতে লাগলো। ততক্ষণে নেকড়েটা একটা কুকুরের ঘাড় কামড়ে ধ'রে নিয়ে পালিয়ে গেল। ফ্রান্সিস ধনুক হাতে নেবারও অবসর পেল না। ও নেমে গাড়ি থেকে একটা কুকুরকে খুলে নিয়ে গাড়ির পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলো। বিজোড় হ'লে গাড়ি টানায় অসুবিধে হ'বে।

রাত্রে তাঁবু খাটানো। খাদ্য তো শেষ। নিজেও খেল না। কুকুরগুলোকেও কিছু খেতে দিতে পারলো না। ঘুমুবে তারও উপায় নেই। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করছে সেই নেকড়েটা এসে না হাজির হয়। একবার খাদ্যের সন্ধান পেয়েছে। এটা আবার ঠিক আসবে। অন্য নেকড়ে বাঘ বা শেয়াল আসতে পারে। সারারাত ঘুমুতে পারলো না। মাঝে-মাঝে তন্দ্রা এসেছে। পরক্ষণেই তন্দ্রা ভেঙ্গে, গেছে। নড়েচড়ে ব'সে তাঁবুর বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। হাতে তীর ধনুক। তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে সারারাত।

পরদিন আবার গাড়ি চললো। অনাহারে শরীর দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। কুকুরগুলোর অবস্থাও তাই। ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে আসছে ফ্রান্সিসের। কিন্তু অনেক

কষ্টে চোখ খুলে রেখেছে। হঠাৎ কুকুরগুলো ডেকে উঠল। সে সজাগ হলো। তীর-ধনুক শক্ত হাতে ধরলো! ভালো ক'রে তাকাতে নজর পড়ল কী-যেন একটা বরফের ওপর দিয়ে আসছে। ঠিক যা ভেবেছে তাই। একটা ছাই-রঙা নেকড়ে বাঘ। ওটা সেই বাঘটাই। কারণ একটা কুকুর শিকার ক'রে ওটার সাহস বেড়ে গেছে। গুটি-শুটি মেরে নেকড়ে বাঘটা এগিয়ে আসছে। সে গাড়ি থামাল তারপর বাঘটার দিকে নিশানা ক'রে ছুঁড়ল। দুর্বল হাতের ছোঁড়া তীর। নেকড়েটার পাশে বরফে গেঁথে গেল। নেকড়েটা একটু পেছনে সরে গেলো! তারপর আবার আসতে লাগলো। এবার ফ্রান্সিস মনে জোর আনল। নেকড়েটাকে না মারতে পারলেও ওটাকে আহত করতেই হবে। নইলে সব ক'টা কুকুর ও শিকার করবে। তখন এই বরফের প্রান্তরে মৃত্যু অনিবার্য। এবার নিশানা ঠিক ক'রে সে তীর ছুঁড়ল। তীরটা এবার নেকড়েটার পেটের মধ্যে লাগলো। নেকড়েটা শূন্যে লাফিয়ে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গে সে আর একটা তীর ছুঁড়ল। তীরটা লাগলো কিনা ও বুঝতে পারলো না। কিন্তু নেকড়েটা একটা গোঁ-গোঁ শব্দ তুলে পালালো। এই ক্ষণিক উত্তেজনার পর শরীরে আবার ক্লান্তি নামলো। অবসাদে ফ্রান্সিস পা ছড়িয়ে প্রায় শুয়ে পড়ল। শক্ত হাতে লাগাম ধ'রে রাখতে পারছে না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে আসছে। কখন সন্ধ্যে হয়েছে, রাত্রি নেমে এসেছে—তার খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা তীব্র আলো চোখে লাগতে ও চোখ মেললো। দেখল- পরিষ্কার আকাশে দিগন্তের ওপর মধ্যরাত্রির সূর্য জ্বলছে। বিচিত্র বর্ণের আলোর বন্যা নেমেছে চারিদিকে।

সে এক অপার্থিব অপরূপ দৃশ্য। দিগন্তবিস্তৃত বরফের মধ্য থেকে কত রকমের কত বর্ণের আলো বিচ্ছুরিত হ'তে লাগলো। দামী চুনীপান্নার পাথরের মতো মনে হ'তে লাগলো বরফের টুকরোগুলোকে। কোথাও তুষারকে মনে হ'তে লাগলো গলিত সোনার স্রোত। খুব উজ্জ্বল আর বর্ণাঢ্য হ'য়ে উঠলো চারিদিক। আলো আর রঙের খেলা চললো কিছুক্ষণ। হঠাৎ সব আলো রং মুছে গেলো। মেঘের মত ঘন কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা পড়ল মধ্যরাত্রির সূর্য। আবার অন্ধকার নেমে এল। ফ্রান্সিস ক্লান্তিতে চোখ বুঁজলো। গাড়ি চলল ঢিকিয়ে-ঢিকিয়ে। কতক্ষণ ও এই পথে অসাড়ের মত পড়েছিল জানে না।

হঠাৎ অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট কুকুরের ডাক শুনতে পেলো? ওর গাড়ির কুকুরও একটা ডেকে উঠলো। অবসাদগ্রস্ত শরীরটা একটু টেনে তুলে দূরে তাকাল। অন্ধকার কিছুই দেখতে পেল না। আবার কুকুরের ডাক। এবার অনেকটা স্পষ্ট। কুকুরের ডাক যেদিক থেকে আসছে, সেইদিকে গাড়ির মুখ ঘোরালো। টাল সামলাতে গিয়ে হঠাৎ ওর মাথাটা ঘুরে উঠলো। সে অজ্ঞানের মত হ'য়ে গেলো। হাতের লাগাম খুলে গেলো। ও গাড়িতে বসার আসন থেকে গড়িয়ে পড়লো বরফের ওপর। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বোধটাই আর শরীরে রইলো না।

* * *

ফ্রান্সিস যখন চোখ খুললো, তখন দেখলো একটা তাঁবুর নীচে পশুলোমের বিছানায় ও শুয়ে আছে। শরীরের অসাড় ভাবটা কমেছে। তাঁবুটা বেশ বড়। সীল মাছের তেলের দীপ জ্বলছে। এস্কিমোদের মত পোষাক-পরা একটা লোক উনুনের ধারে ব'সে আছে। লোকটা একটা ছোট চামড়ার ব্যাগের মত নিয়ে এল। ফ্রান্সিস তাকিয়ে

আছে। লোকটা হাসল। তারপর এস্কিমোদের ভাষায় কি বললো। ফ্রান্সিস শুধু 'গরম' এই কথাটা বুঝল। বুঝল, যে ব্যাগটায় গরম জল ভরা আছে। ও হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিল। তারপর উঠে ব'সে হাতে-পায়ে সেঁক দিতে লাগলো। আস্তে-আস্তে শরীরের অসাড় ভাবটা একেবারেই কেটে গেলো। লোকটা তখনও দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিসকে সুস্থ হ'তে দেখে ও খুব খুশী হ'ল। হাতের ভঙ্গী ক'রে বললো, ফ্রান্সিস কিছু খাবে কিনা। ফ্রান্সিস মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো। লোকটা আগুনের ধারে গেলো। থালায় ক'রে গরম-গরম রুটি আর বল্গা হরিণের মাংস নিয়ে এলো। সে আস্তে-আস্তে খেতে লাগলো। উপোসী পেট মুচড়ে ওঠে। তবু খেতে হ'বে। সুস্থ থাকতে হ'বে। ও খেতে লাগলো।

খেতে গিয়ে এবার ঠোঁট দু'টো জবালা ক'রে উঠলো। আঙুল বোলালো ঠোঁট দু'টোয়। ঠাণ্ডায় ঠোঁট ফেটে গেছে। আঙুলে রক্তের ছোপ লাগলো। ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরিয়েছে। কিছুই মুখে তুলছে পারছে না। ফ্রান্সিস ইসারায় লোকটাকে কাছে থাকলো। লোকটা কাছে এলো আঙুল দিয়ে ঠোঁট দু'টো দেখালো। লোকটা হাসলো। চলে গেলো তাঁবুটার কোণার দিকে। আঙুলের ডগায় মাখনের মত হলদেটে কি একটা জিনিস নিয়ে এলো। ফ্রান্সিসের ঠোঁটে আস্তে-আস্তে লাগিয়ে দিল। জবালাভাবটা একটু কমলো। সে আবার খেতে লাগলো? ও খাচ্ছে, তখনই কয়েকজন তাঁবুতে ঢুকলো। সবারই পরণে এস্কিমোদের মতো পোষাক। তাদের মধ্যে একজনের চেহারা দশাসই। তার কোমরে রুপোর বেল্ট মতো। মাথা-ঘাড় ঢাকা টুপীটা মেরুশেয়ালের চামড়ার। লেজটা পেছনদিকে ঝুলছে। পরণের পোষাকও অন্যদের চেয়ে পরিষ্কার। ফ্রান্সিস বুঝল এই লোকটা এদের সর্দার। সর্দার এগিয়ে এসে এস্কিমোদের ভাষায় কি জিজ্ঞেস করলো। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে না-বোঝার ভঙ্গী করলো। তখন সর্দারটি ভাঙা-ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বলল, 'এখন কেমন আছেন?'

ফ্রান্সিস বললো, 'ভালো আছি। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।'

সর্দার হেসে বললো, 'আর ঘণ্টাখানেক দেরী হ'লে আপনি ঠাণ্ডায় জমে যেতেন। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন।'

—'কি হ'য়েছিল বলুন তো?'

—আপনার স্লেজগাড়ির কুকুরের ডাক আমরা শুনেছিলাম। কি ব্যাপার দেখতে যাবো, তখনই দেখি আপনার স্লেজগাড়িটা কুকুরগুলো অনেক কষ্টে টেনে আনছে। কাছে আসতে এবার দেখলাম, চালকের আসনটা শূন্য। বুঝলাম, চালকটি বরফের মধ্যে কোথাও পড়ে গেছে। আমরা মশাল জেবলে নিয়ে স্লেজগাড়ি নিয়ে ছুটলাম। আপনার গাড়িটার চলার দাগ তখনও বরফের ওপর রয়েছে। ভাগ্য ভালো তখন তুষার-বৃষ্টি হয়নি। তুষারবৃষ্টি হ'লে ঐ দাগ ঢাকা পড়ে যেত। আমরা দাগ ধ'রে-ধ'রে কিছুদূর যেতেই দেখলাম, আপনি বরফের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। ধরাধরি ক'রে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে এলাম।' তারপর সেই লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'ওর নাম নুয়ালিক। ওর শুশ্রূষাতেই আপনি সুস্থ হয়েছেন।'

ফ্রান্সিস হেসে নুয়ালিকের দিকে তাকাল। দেখল, নুয়ালিকও হাসছে। ও হাত বাড়িয়ে নুয়ালিকের একটা হাত ধ'রে মৃদু চাপ দিয়ে। এস্কিমোদের ভাষায় বলল, 'কুয়অনকা।'

নুয়ালিক কথাটা শুনে আরো খুশী হ'য়ে হাতটা ঝাঁকাতে লাগলো।

এবার সর্দার জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?'

সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়লো হ্যারি আর সাঙখুর কথা। ও এতক্ষণ নিজের কথায় ভাবছিল। ফ্রান্সিস বললো, 'কোটল্ডের উদ্দেশ্যে আমি আমার বন্ধু আর একজন এস্কিমো বেরিয়েছিলাম।'

—'এই জায়গাই কোটল্ড। তবে আপনি বোধ হয় অনেক ঘুরে-ঘুরে এসেছেন?'

—'বলতে পারেন, আমার বন্ধু এসে পেঁচেছে কিনা? প্রচণ্ড তুষার-ঝড়ে আমি ওদের থেকে বিছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিলাম।'

—'আমি তো ঠিক বলতে পারছি না।' সর্দার বললো, 'আপনি ভাববেন না। বিশ্রাম করুন, আমি খবরের জন্যে লোক পাঠাচ্ছি। কিন্তু আপনারা এখানে কার কাছে আসছিলেন?'

—'এখান থেকে আমরা বাট্টাহালিড যাবো। আমরা ভাইকিং। রাজা এনর সোক্কাসনের আমন্ত্রণে আমরা এখানে এসেছি।'

—'তাই বলুন। আপনারা আমাদের রাজার অতিথি।'

এস্কিমো-সর্দার খুব খুশী। হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরলো। বললো, কিছু ভাববেন না। আপনার বন্ধুর খোঁজ করছি। কয়েকদিন বিশ্রাম করুন। বাট্টাহালিড যাবার ব্যবস্থা ক'রে দেব।'

বলে সর্দার সঙ্গের লোকদের কি নির্দেশ দিল, তারপর সবাইকে নিয়ে চলে গেল।

বেশী খেতে পারলো না ফ্রান্সিস। ঠোঁটের জ্বালা-জ্বালা ভাবটা কমলেও খিদেটা যেন একেবারেই মরে গেছে। তবু কিছু খাবার পেটে গেল ব'লেই শরীরটায় যেন একটু সাড় এল। এবার ঘুমুতে পারলে অনেকটা ক্লান্তি কাটবে। সে পাশ ফিরে শুলো। কিন্তু তখনই তাঁবুর বাইরে থেকে হ্যারি ডাকছে শুনলো, 'ফ্রান্সিস-ফ্রান্সিস।'

—'ওঃ হ্যারি।'

হ্যারি ততক্ষণে তাঁবুকে ঢুকে ফ্রান্সিসের বিছানার দিকে ছুটে এসেছে। হ্যারি আর তাকে উঠে বসার সুযোগ দিলো না। শোয়া অবস্থাতেই ওকে জড়িয়ে ধরলো। ধ'রে রইল কিছুক্ষণ। ফ্রান্সিসই জোর করে ছাড়ালো নিজেকে। দেখলো হ্যারির চোখে জল। সে হাসলো, 'এই—কী ছেলেমানুষি হচ্ছে?'

সাঙখু তাঁবুর ভেতরে ঢুকে দুই বন্ধুর কাণ্ড দেখে হতবাক। নুয়ালিক আগুনের ধারে বসেছিল। সাঙখু গিয়ে ওখানে বসলো। কথাবার্তা বলতে লাগলো।

হ্যারি বিছানার পাশে বসলো। বললো, 'তুষার ঝড় কেটে যাবার পর দু'দিন আমরা তোমাকে খুঁজে বেরিয়েছি। তুষার ঝড়ে তোমার গাড়ির চলার দাগ মুছে গিয়েছিলো। তাই তোমার গাড়ির চলার পথের কোন হদিশ পাইনি। তবু খুঁজেছি। এদিকে দেখি খাদ্য ফুরিয়ে আসছে। কুকুরগুলোও দিন-রাত ছুটে-ছুটে ক্লান্ত। স্থির করলাম, কোটল্ডে চলে আসি। হয়তো তুমি এর মধ্যে কোটল্ডে চ'লে এসেছো। এখানে এসে তোমাকে পেলাম না। য়ুরোপের লোকেরা তো এখানে বেশী আসে না, তুমি এলে সঙ্গে-সঙ্গেই খবর পেতাম।'

একটু থামলো হ্যারি। তারপর বলতে লাগলো, 'দু'দিন হ'ল এখানে এসেছি। প্রতিদিন সকালে-বিকেলে বেরিয়েছি তোমার খোঁজে। যদি তোমার কোন হদিশ পাই। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হ'লো। তারপর এই মাত্র একজন লোক গিয়ে তোমার এখানে আসার সংবাদ দিলো। শুনেই ছুটে আসছি।'

হ্যারি একনাগাড়ে কথা ব'লে যেন হাঁপিয়ে উঠলো। ফ্রান্সিস হাসলো। তারপর ওর পথে কি ঘটেছে সবাই বললো। তারপর বললো, 'মধ্যরাত্রির সূর্য দেখেছো কী? অপরূপ সেই দৃশ্য।'

—'না।' হ্যারি বললো, 'বোধহয় মেঘ-কুয়াশার জন্যে আমরা দেখতে পাই নি।' তারপর বললো, 'তুমি এখন ঘুমোও, রাত হ'য়েছে। কালকে তোমাকে আমাদের আস্তানায় নিয়ে যাবো।'

* * *

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস তাঁবুর ফাঁক দিয়ে দেখলো আচমকা উজ্জ্বল রোদ। ওর নিজের শরীরটাও আজকে বেশ ঝর্‌ঝরে লাগছে। ক্লান্তি অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। ক্লান্তি অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। নুয়ালিক এসে খাবার দিয়ে গেলো। তখনই হ্যারি আর সাঙখু এলো। হ্যারি বললো, 'এখন শরীর কেমন?'

—'অনেকটা ভালো।'

—'আমাদের আস্তানায় যেতে পারবে তো?'

—'পারবো। কিন্তু সর্দার না এলে কী ক'রে যাই।'

ও নুয়ালিকে ডাকল, 'নুয়ালিক সর্দার কখন আসবে?'

—'এটাই তো সর্দারের তাঁবু। আসবেন এক্ষুণি।'

ফ্রান্সিস বেরোবার জন্যে তৈরী হতে-হতে সর্দার এলো। ফ্রান্সিস বললে, 'আমার বন্ধু এসে গেছে। আমি ওদের সঙ্গে যাচ্ছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি আর নুয়ালিক আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'

সর্দার কিছু বললো না, হাত বাড়ালো শুধু। ফ্রান্সিস ওর সঙ্গে হাত মেলালো। আরপর হ্যারি আর সাঙখুর সঙ্গে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো।

বাইরের আলো অন্যদিনের চেয়ে একটু উজ্জ্বল। ফ্রান্সিস বেশ খুশী মনে পথ চলতে লাগলো। একসময় ও হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার শ্লেজগাড়িটা?'

—'ওটা আমি কাল রাতেই নিয়ে গেছি। কুকুরগুলো তো আমারই পোষা কুকুর' —'সাঙখু বললো।

* * *

ছোট্ট জায়গা 'কোর্টল্ড'। বেশীর ভাগই তাঁবু, তবে বড়-বড় তাঁবুও আছে। পাথরের বাড়িও আছে, দেয়ালগুলো বেশ মোটা। সড আর পাথর দিয়েই বাড়িগুলো তৈরী। এমনি একটা সড আর পাথরে তৈরী বাড়িতে হ্যারিরা আস্তানা নিয়েছে। ঘরে ঢুকে ফ্রান্সিস দেখলো, বেশ ভারী-ভারী পাথরের ঘরটা, ভেতরটা বেশ গরম। শ্লেজগাড়ি থেকে জিনিসপত্র আগেই নামানো হয়েছিল। সিন্ধুঘোটকের চামড়া, সীল-মাছের চামড়া, এসব দিয়ে সাঙখু ফ্রান্সিসের জন্য একটা বিছানা করে দিল। ফ্রান্সিস তাতে আধশোয়া হয়ে শুয়ে পড়লো। শরীরের দুর্বলতা এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি।

বিকেলের দিকে ফ্রান্সিস শ্লেজগাড়িটা নিয়ে বেরলো। কাছাকাছি ঘুরে ফিরে

দেখলো। এমনি বিশ্রাম নিতে গিয়ে তিনদিন কেটে গেল। এর মধ্যে এস্কিমোদের সর্দার দু'দিন এসেছিল। কয়েকটা এডার পাখী দিয়ে গিয়েছিল খাবার জন্যে।

ফ্রান্সিস সেদিন বললো, 'হ্যারি আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আর দেরী করা ঠিক হবে না। বাবা দেড়মাসের মধ্যে কাজ সেরে ফিরতে বলেছেন। আর সময় নষ্ট নয়, চলো কালকেই বাট্টাহালিড রওনা দিই।'

—'বেশ! তুমি সুস্থবোধ করলে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে সাঙখু সঙ্গে থাকলে ভালো।'

—'দরকার নেই। দু'জনে একা গাড়ি নিয়ে যাবো।'

—'বেশ চলো, তাই যাওয়া যাবে।'

সাঙখু রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করছিল। ফ্রান্সিস তাকে কাছে ডাকল। ও কাছে আসতে ফ্রান্সিস কোমরবন্ধনী থেকে দু'টো মোহর বের করে ওর হাতে দিল। সাঙখু খুব খুশী হয়ে দাঁত বের করে হাসল। ফ্রান্সিস বললো, 'সাঙখু, কাল সকালেই আমরা বাট্টাহালিড রওনা হচ্ছি তুমি। আঙ্গামাগাসালিকে ফিরে যাও।'

সাঙখুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ওর বোধহয় ইচ্ছে ছিল, ফ্রান্সিসদের সঙ্গে বাট্টাহালিড্ যাবার। ফ্রান্সিস পরদিন সব মালপত্র বাঁধা-ছাদা করে শ্লেজগাড়িতে রাখল। শুকনো সীলমাছ, সিন্ধুঘোটকের মাংস এসব নিল। খাবার-দাবার একটু বেশীই নিল। সাঙখু সঙ্গে থাকবে না. পথ হারালে যাতে বিপদে পড়তে না হয়।

সূর্য দেখে উত্তর দিকটা ঠিক করে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। একবার পেছন ফি.র দেখলো, সাঙখু ম্লানমুখে পাথরের ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

আগের দিন এস্কিমো-সর্দারের সঙ্গে কথা হয়েছিল। সে বলেছিল, এখান থেকে সোজা উত্তরে বাট্টাহালিড। পথে তুষার ঝড়ের পাল্লায় না পড়লে চার-পাঁচদিন লাগবে। সেই অনুযায়ী ফ্রান্সিস সোজা উত্তরদিকে গাড়ি চালাতে লাগল। বরফের প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে শ্লেজগাড়ি বেশ দ্রুতগতিতেই ছুটলো।

সেই প্রান্তর দিয়ে যেতে-যেতে মাঝে-মাঝেই গলা-বরফের জায়গায় পড়তে লাগলো। গলা বরফের মধ্যে কুকুরগুলো পড়ে যেতে লাগল। ফ্রান্সিসরা নেমে গাড়িটাকে টেনে পিছিয়ে আনতে লাগলো. তারপর শক্ত বরফ-এলাকা দিয়ে সাবধানে গাড়ি চালাতে লাগলো। তবু গাড়ি গলা বরফের মধ্যে পড়তে লাগলো। ফ্রান্সিস এবার বুদ্ধি করে সন্দেহ হলেই গাড়ি থামিয়ে ফেলছিল। বরফের টুকরো তুলে ছুঁড়ছিল প্রান্তরের দিকে। বরফের টুকরোটা ডুবে গেলেই বুঝছিল গলা বরফ। পাশ কাটিয়ে শক্ত বরফের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল।

সারাদিন গাড়ি চালিয়ে সন্ধ্যেবেলা জায়গা বেছে নিয়ে তাঁবু খাটালো। এস্কিমোদের মতো চকমকি পাথরে ইস্পাতের টুকরো ঠুকে আগুন জ্বালল। সীলমাছের তেলের আলোয় তাঁবু গরম রাখা ও রান্না দু'টোই চালাতে লাগলো। রাত কাটিয়ে পরদিন আবার পথ চলা।

যেদিন চাঁদ-তারার আলো স্পষ্ট থাকে, মেঘ-কুয়াশা কম থাকে, সেদিন রাত্রেও গাড়ি চালাতে লাগলো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাট্টাহালিড্ পেঁছতে হবে। মাঝ-মাঝে শক্ত-শক্ত বরফের বড়-বড় টুকরো ছড়ানো প্রান্তর পড়তে লাগলো। বরফের ধাক্কা বাঁচিয়ে

কুকুরগুলো যাতে চোট না খায়, এইসব দেখে-শুনে চালাতে গিয়ে গাড়ি চলতে লাগলো ধীর গতিতে। ও-রকম এলাকা তিন-চার জায়গায় পড়ল।

এর মধ্যেই একদিন ফ্রান্সিসরা দেখলো অরোরা বোরোলিস বা 'মেরুজ্যোতি'। উত্তর-মেরুর চৌম্বকক্ষেত্র থেকে এই বিচিত্র আলোর উৎপত্তি। উত্তর দিগন্তের ওপরে আকাশটায় যেন লক্ষ-লক্ষ আতসবাজি জ্বলে উঠলো। বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল আলোর মালা। চোখ ধাঁধানো আলো নয়, নরম জ্যোৎস্নার মত আলো। বিচিত্র সেই আলোর খেলা—এ-এক অভিজ্ঞতা।

পথে কখনও কখনও কয়েকটি এস্কিমো পরিবারের একত্র বসতি এলাকা পেলো। এস্কিমোদের সীলমাছের চামড়ার তৈরী তাঁবুকে বলে 'টুপিক'। এসব টুপিকেও আশ্রয় জুটল মাঝে-মাঝে। এভাবে চলে-চলে পাঁচদিনের মাথায় ওরা বাট্টাহালিড্ পেঁছিলো।

* * *

বাট্টাহালিড নামেই রাজধানী। এমন কিছু বড় শহর-টহর নয়। তবে কোর্টল্যেন্ডের চেয়ে বেশ বড়। অনেকটা এলাকা জুড়ে মাটি আর পাথরের তৈরী বাড়ি-ঘর। এখানে শুধু এস্কিমোরাই থাকে না, য়ুরোপীয় শ্বেতাঙ্গরাও অনেক আছে। আবার চারিদিকে এস্কিমোদের টুপিকও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

তখন সকাল। পাথরের বাড়িঘর থেকে, টুপিক থেকে অনেকেই ঔৎসুক্যের সঙ্গে ফ্রান্সিসদের দেখলো। রাজবাড়ি সহজেই পাওয়া গেল। পাথর, মাটি আর সড দিয়ে তৈরী রাজবাড়িটা বেশ বড়। এখানে য়ুরোপীয়রাও এস্কিমোদের মতো চামড়ার পোষাক পরে। রাজবাড়ির দিকে যেতে গিয়ে ওরা দূর থেকেই গীর্জাটা দেখতে পেল। বেশ উঁচু পাথরের তৈরী গীর্জাটা, তার মাথায় একটা বড় কাঠের ক্রশ।

ওদের গাড়ি রাজবাড়ির সামনে দাঁড়ালো। দেখলো, কুঠার হাতে দু'জন য়ুরোপীয় সৈন্য রাজবাড়ি পাহারা দিচ্ছে। ওদের সঙ্গে ফ্রান্সিস নরওয়ের ভাষায় কথা বললো। কথা বুঝতে বা বলতে ওদের কোন অসুবিধে হলো না। ওদের মধ্যে একজন রাজবাড়ির মধ্যে রাজাকে সংবাদ দিতে চলে গেল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি অপেক্ষা করতে লাগলো। একটু পরেই রাজা এনর সোক্কাসন নিজে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে-পেছনে এলেন আরো কয়েকজন। বোধহয় মন্ত্রী ও অমাত্যরা। ফ্রান্সিস ও হ্যারি মাথা নুইয়ে সকলকে সম্মান জানালো। ফ্রান্সিস ভাইকিং রাজার চিঠিটা রাজাকে দিল।

রাজা হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিসের হাত ধরলেন। বললেন, 'আপনারা এসেছেন, খুব খুশী হয়েছি। এখন কয়েকদিন বিশ্রাম করুন। আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। তারপর কাজের কথা ভাবা যাবে। চলুন রাজবাড়ির ভেতরে।'

রাজা ও অমাত্য সকলেরই পরণে ছাই রঙের গরম কাপড়ের আলখাল্লামত। মাথা ঘাড় ঢাকা সেই কাপড়ে। কোমরে চেন বাঁধা, রাজার কোমরের চেনটা সোনার। ফ্রান্সিস আর হ্যারি রাজা ও অমাত্যদের সঙ্গে রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকল। কালো-কালো বড়-বড় পাথরের ঘরগুলো, বারান্দা, অলিন্দ। এসব পেরিয়ে একটা বড় হলঘর। এটাই বোধহয় রাজসভাগৃহ। কারণ একটা পাথরের বেদী রয়েছে। তাতে ফুললতাপাতা



খোদাই করা। বল্গা হরিণের চামড়ার আসন তাতে। এটাতেই রাজা এসে বসলেন। আরো কিছু-কিছু কাঠের আসন রয়েছে, মন্ত্রী-অমাত্যেরা সে-সব আসনে বসলেন। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকেও দু'টো আসনে বসতে দেওয়া হলো।

যদিও দিনের বেলা, তবু সভাগৃহে জ্বলছে কয়েকটা মশাল।

রাজা পাথরের বেদী থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'আপনারা সকলেই আমাদের পূর্বপুরুষ 'এরিক দ্য রেডে'র কথা জানেন। আরো জানেন তাঁর গুপ্তধনের কথা। বহুদিন চেষ্টা করেও আজও কেউ গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারেনি।' তারপর একটু থেমে বলতে লাগলেন, 'আপনারা জানেন, ভাইকিংরা বীরের জাতি। তাই ভাইকিংদের রাজার কাছে আমি এই গুপ্তধন আবিষ্কারের কথা বলি। তখন তিনি ভাইকিং জাতির গর্ব ফ্রান্সিস এবং তার বন্ধুদের সাহায্য নেবার কথা বলেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, ফ্রান্সিস ও তাঁর বন্ধু এখানে এসেছেন। ফ্রান্সিস ও তাঁর বন্ধুরা এই গুপ্তধন খুঁজে বের করবেন, এই বিশ্বাস আমি রাখি। কারণ'—

এই বলে রাজা ফ্রান্সিসের আনা সোনার ঘণ্টা, হীরে, মুক্তো এসবের কথা সংক্ষেপে বললেন। রাজার বক্তৃতা শেষ হলে সকলে করতালি দিল। রাজা পাথরের সিংহাসনে বসে ফ্রান্সিসকে ইশারায় ডাকলেন। ফ্রান্সিস উঠে রাজামশাই-এর কাছে গেল। রাজা একজন এস্কিমোকে কাছে ডাকলেন। সাধারণ এস্কিমোদের চেয়ে এই লোকটি অন্য-রকম। বেশ লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান। রাজা তাকে দেখিয়ে বললেন, 'ফ্রান্সিস, এর নাম 'নেসাক''। নেসাক'ই আপনাদের দেখাশুনো করবে। আপনারা ওর সঙ্গে যান।'

দু'জনে রাজাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চলে এলো। নেসাক' এসে ওদের কাছে দাঁড়াল। পরিষ্কার নরওয়ের ভাষায় বললো, 'আমার সঙ্গে আপনারা আসুন'।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নেসাকে'র সঙ্গে সভাগৃহের বাইরে এলো।

নেসাকে'র পেছনে আসতে-আসতে দেখল, একটা চত্বরে অনেক কুকুর বাঁধা। এর পরেই হরিণশালা, আঁকাবাঁকা শিঙওলা অনেক বল্গা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। জায়গায় তার দিয়ে ঘেরা। বোঝা গেল, স্লেজগাড়ি চালাবার জন্যে কুকুর আর হরিণগুলোকে রাখা হয়েছে।

পাথরের বারান্দা দিয়ে যেতে গিয়ে, ওরা দু'পাশে কয়েকটা ঘর দেখল। কোনটা অস্ত্র-শস্ত্র রাখার ঘর, কোনটায় পুরনো আমলের জিনিসপত্র রাখা, কোনটায় সৈন্যরা থাকে। শেষের দিকে একটা ঘরের সামনে নেসাক' দাঁড়াল। ঘরের দরজাটা শ্লেট-পাথরের তৈরী। নেসাক' দরজাটা খুলল। দেখা গেল, ফ্রান্সিসদের স্লেজগাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র এনে এই ঘরে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সিস বুঝল, এটাই ওদের আস্তানা। দু'জন এস্কিমো ঘরটা গোছ-গাছ করতে লাগল। নেসাক' ওদের নির্দেশ দিতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে লম্বাটে দু'টো পাথরের ওপর ঘাস বিছিয়ে তার ওপর বল্গা হরিণের চামড়া বিছিয়ে বিছানামতো করা হলো। এই দিনের বেলাতেও ঘরটা অন্ধকারমত। নিবু-নিবু হয়ে আসা একটা সীলমাছের তেলের প্রদীপ জ্বলছিল।

প্রদীপটার সল্‌তে উস্‌কে দিয়ে নেসাক' বললো, 'তা হ'লে আপনারা বিশ্রাম করুন, দরকার পড়লেই দয়া করে ডাকবেন।'

সব এস্কিমোরা চলে গেল। হ্যারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'এবার শোয়া যাক'। ও বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে বললো, 'দেখেছো ফ্রান্সিস, ঘরটা বেশ গরম।'

—'ঐ সীলমাছের প্রদীপের জন্যে। এই প্রদীপকে এস্কিমোরা নানা কাজে লাগায়'। ঘরময় পায়চারী করতে-করতে ফ্রান্সিস বললো।

—'তুমি কি সারাদিনই পায়চারী করবে না কি ?'

ফ্রান্সিস হেসে বললো, 'জানো তা কোন কিছু গভীরভাবে চিন্তা করবার সময় আমি পায়চারী করি।

—'হুঁ, কী ভাবছো অত ?'

—'এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের কথা। এখানকার রাজবাড়ির কোথাও আছে সেই ধনভাণ্ডার। কিন্তু কোথায় ? কী সূত্র ধরে এগোলে ওটার হদিশ পাবো ?'

—'রাজার সঙ্গে কথা বলো। দেখো সূত্র পাও কি না ?'

—'হুঁ, রাজবাড়ির অন্দরমহলটা ভালো করে দেখতে হবে। যে ঘরে এরিক দ্য রেড থাকতেন, সেই ঘরটাও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে হবে। অনেক কাজ।'

—'এখন কয়েকটা দিন তো বিশ্রাম কর।'

ফ্রান্সিস হেসে বললো, 'বিশ্রাম করবার উপায় নেই। তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে হবে, বাবার হুকুম।'

সেই দিনটা ওরা অবশ্য শুয়ে-বসে কাটালো। নেসার্ক ওদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করল। বিকেলের দিকে ফ্রান্সিস নেসার্ককে ডেকে বললো, 'তুমি আমাদের স্লেজগাড়িটা তৈরী রাখতে বলো। আমরা একটু ঘুরে ফিরে দেখবো।' সে মাথা নেড়ে চলে গেল।

স্লেজগাড়িটা বিকালে রাজবাড়ির বাইরে আনা হলো। ফ্রান্সিস ও হ্যারি গিয়ে গাড়িতে উঠলো। গাড়ি ছেড়ে দিল। বাট্টাহালিড এমন কিছু বড়ো শহর নয়। কয়েক পাক ঘুরতেই সব বাড়িঘর, টুপি দেখা হয়ে গেল। এবার ওরা গীর্জাটার কাছে এল। গীর্জাটা বেশ বড়ো, কালো-কালো পাথর গেঁথে তৈরী। এরিক দ্য রেড নিজে নাকি এটা তৈরী করিয়েছিলেন। ওরা গাড়ি থেকে নেমে গীর্জাটায় ঢুকলো। গীর্জার সামনের চত্বরে অনেক ক্রুশ পোঁতা। তার মানে এটাকে কবরখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ওরা গীর্জার মধ্যে ঢুকলো। বেশ অন্ধকার-অন্ধকার ভেতরটা। মেঝে থেকে উঁচুতে দু'তিনটে কাঁচের জানালা। তাতে লাল-নীল-হলুদ নানা রঙের কাজ করা। তারই মধ্যে দিয়ে বাইরের একটু আলো এসে পড়েছে। মেঝের কিছু কাঠের বেঞ্চিমত পাতা। সামনে পাথরের বেদী। তার ওপর ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের একটা মূর্তি। বেশ বড় মূর্তিটা, পেতলের তৈরী। একটা কাঠের বেদীর ওপর সেটা রাখা, তার সামনে কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। ভেতরটায় আর বিশেষ কোন সাজসজ্জা নেই। চৌকোনো পাথর দিয়ে মেঝেটা তৈরী। সব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, অনেকদিনের পুরনো গীর্জা। দেয়ালে কোথাও-কোথাও সবুজে শ্যাওলা ধরেছে।

গীর্জা থেকে ওরা যখন বেরিয়ে এল, তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। ওরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এলো। বিছানায় গা এলিয়ে দিতে ফ্রান্সিস বলল, 'আর এভাবে সময় সময় কাটানো নয়। কাল থেকেই কাজে নামতে হবে।'

—'বেশ তো, লেগে পড়ো।' হ্যারি এই বলে শুয়ে পড়লো।

পরদিন ফ্রান্সিস নেসার্ককে বললো, 'তুমি একটু রাজামশাইকে খবর দাও। বলবে

যে, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

একটু পরেই নেসার্ক ফিরে এলো। বললো, 'আমার সঙ্গে চলুন। রাজা এনর সোক্কাসন আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

ওরা দু'জনে চট্‌পট তৈরী হয়ে নিল। তারপর রাজবাড়ির অন্দরমহলের দিকে চললো। অন্দরমহলটা বড় কিছু নয়। বিশেষভাবে সাজানো-গোজানো কয়েকটা ঘর পেরিয়ে একটা ঘরের সামনে এসে নেসার্ক। বলল, 'আপনারা এই ঘরে যান।'

ঘরে ঢুকে ওরা দেখল, একটা বড় গোল পাথরের টেবিলমত। চারপাশে কয়েকটা কালো ওক্ কাঠের চেয়ার, সবুজ গদী আঁটা। ফ্রান্সিস বুঝলো, এটা রাজার মন্ত্রণালয়। ওরা দু'জনে চেয়ারে বসল। একটু পরেই রাজা এলেন। পরণে সেই ঘাড়-মাথা ঢাকা হলদে গরম কাপড়ের হাঁটু পর্যন্ত আলখাল্লা। কোমরে সোনার চেন। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানালো। রাজামশাই কাঠের চেয়ারে বসে বললেন, 'কী ব্যাপার ফ্রান্সিস ?'

—'দেখুন, আমরা খুব কম সময় নিয়ে এখানে এসেছি। কাজেই তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে যেতে হবে। এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের সন্ধান আজ থেকেই করতে চাই। এজন্যে আপনার অনুমতি চাইছি।'

—'আমার কোন আপত্তি নেই। বলুন, কীভাবে অনুসন্ধান শুরু করতে চান ?'

—'প্রথমে আমি অন্দরমহলের ঘরগুলো দেখবো।'

—'বেশ।' এই বলে রাজা হাতে একটা তালি বাজালেন। নেসার্ক এসে দাঁড়ালো মাথা নীচু করে। রাজা বললেন, 'তুমি অন্দরমহলের সবাইকে কিছুক্ষণের জন্যে দরবারঘরে যেতে বলো।' সে চলে গেল।

—'আপনারা অন্দরমহল দেখতে চাইছেন কেন ?'

—'এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন কোথায় আছে, তরে একটা সূত্র পাই কিনা, সেই-জন্যেই অন্দরমহলটা দেখবো। তারপর দেখবো, এরিক দ্য রেড যে ঘরে থাকতেন, বিশেষ করে যে ঘরে তিনি জীবনের শেষ বছরগুলো কাটিয়েছেন।' ফ্রান্সিস বললো।

—'অন্দরমহলের শেষ ঘরটাতেই এরিক দ্য রেড শেষ জীবনে থাকতেন। ঐ ঘরটাকে অনেকটা যাদুঘরের মতো করে রাখা হয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত পোষাক, কালিদান-কলম, বইপত্র এসব রাখা আছে। আপনারা অন্য ঘর-টরগুলো দেখুন। ঐ যাদুঘরে সবশেষে আপনাদের নিয়ে যাবো। ঐ ঘরের চাবিটা শুধু আমার কাছেই থাকে।'

—'বেশ।'

নেসার্ক তখনই এসে বললো, 'চলুন।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি চললো অন্দরমহলের দিকে। একই রকম পর-পর কয়েকটা পাথরের তৈরী ঘর, দরজাগুলো কাঠের। ঘরের ভেতরে বল্গা হরিণের চামড়ার বিছানা। শুধু রাজা-রানীর ঘরের মেঝেয় লতাপাতা আঁকা কার্পেট বিছানো। চোখ-ধাঁধানো সাজসজ্জা নেই সে-সব ঘরে। ফ্রান্সিস সবগুলো ঘরই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল। সব ঘরই এক রকম, বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। একটু অন্ধকার-অন্ধকার ঘরগুলোয় সীলমাছের তেলের প্রদীপ জ্বলছিল। রাজা-রানীর শোয়ার ঘরটাই যা সুসজ্জিত।

রানী বিছানায় বসেছিলেন। ওদের দেখে এগিয়ে এলেন। ফ্রান্সিস ও হ্যারি রানীর ডান হাতে চুম্বন করে সম্মান জানালো। রানী একটা সবুজ রঙের নরম কাপড়ের গাউন পরেছিলেন। মাথায় কোন ঢাকা ছিল না। রানী অপরূপ সুন্দরী, গায়ের রঙ দুধে-আলতা মেশানো। গলায় একটা মুক্তোর মালা, সাজ-সজ্জায় জাঁক-জমক কিছু নেই। তিনি সুরেলা গলায় বললেন, 'আপনারা ভাইকিংদের দেশ থেকে এসেছেন?'

ফ্রান্সিস হেসে বললো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'ওর কাছে শুনলাম, আপনারা এরিক দ্য রেডের গুপ্তধনের সন্ধান করবেন।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আমার মনে হয়, এরিক দ্য রেডের যাদুঘরে কিছু সূত্র পেলেও পেতে পারেন।'

—'এ কথা কেন বলছেন?'

—'কারণ, ঐ ঘরটাই সবচেয়ে পুরানো। এই ঘরগুলো তৈরী হয়েছে পরে।'

ফ্রান্সিস মনে-মনে রানীর বুদ্ধির প্রশংসা করল। ও বললো, 'আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা এখন ঐ যাদুঘরেই যাবো।'

রানী কোন কথা না বলে হাসলেন। ওরা রানীকে সম্মান জানিয়ে ফিরে চললো। ওরা মন্ত্রণালয়ে ফিরে এলো। রাজা ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

ফ্রান্সিস বললো, 'মহারাজ, এবার আমরা এরিক দ্য রেডের যাদুঘরটা দেখবো।'

ওরা চললো অন্দরমহল পেরিয়ে একেবারে শেষের দিকে। সেখানেই একটা ঘরের সামনে এসে রাজা দাঁড়ালেন। তাঁর কোমরে চেন-এর সঙ্গে বাঁধা দুটো বড়-বড় চাবি। তারই একটা খুলে নিলেন। ঘরে ঝুলছে মস্তবড় একটা তালা। তিনি চাবি দিয়ে তালাটা খুললেন। বেশ ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে দরজাটা খুলতে হলো। বোঝাই গেল, ঘরটা অনেকদিন খোলা হয়নি।

ওরা ঘরের ভেতরে ঢুকলো। ভেতরটা কেমন অন্ধকার-অন্ধকার। একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, আলো না হলে কিছুই দেখা যাবে না। নেসার্ক এইজন্যেই বোধ হয় একটা মশাল নিয়ে এসেছিল। চকমকি পাথর ঠুকে আলো জ্বালল। এবার ঘরের পুরানো আসবাবপত্র সব দেখা গেল। বেশীর ভাগই কালো ওক্ কাঠের তৈরী। চারিদিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, এরিক দ্য রেডের ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র। একটা বিরাট পাথরের পাশে টেবিলের ওপর রাখা আছে রুপোর কলমদানি, রুপোর দোয়াত। পাশে একটা কাঠের আলমারীমত। তাতে রাখা আছে তাঁর ব্যবহৃত পোষাকপত্র। অত্যন্ত দামী যে-সব জাঁকালো পোষাক। সোনার কাজ করা বেল্ট। আর একটা জায়গায় আছে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র। মিনে-করা খাপে ছোরা, হাতীর দাঁতের বাঁটে সোনার কাজ করা তরোয়াল। খাপটায় হীরে-বসানো, মিনে-করা সেটা।

পাথরের টেবিলের ওপর একটা বই সহজেই নজরে পড়ে। লাল রঙের চামড়ার মলাট দেওয়া বই। রাজা বইটা টেবিল থেকে তুলে নিলেন। ফ্রান্সিস চারদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখছিল। রাজা বইটা হাতে নিয়ে ফ্রান্সিসকে ডাকলেন, 'ফ্রান্সিস, এই বইটার কথা আপনাকে বলেছিলাম, বোধহয় মনে আছে আপনার।'

ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে বইটা হাতে নিল। বইটা চামড়ায় বাঁধানো। ভেতরে উল্টে দেখল, বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর অনুবাদ। নরওয়ের ভাষায় লেখা। পাতাগুলো

পাতলা চামড়ার। ফ্রান্সিস বললো, 'এই ওল্ড টেস্টামেণ্ট'-এর অনুবাদ করেছিলেন, তাই না।'

—'হ্যাঁ, সবটার তাঁর নিজের হাতের লেখা।'

ফ্রান্সিস বইটার পাতা উল্টে ভালভাবে দেখতে লাগলো। বহু পুরনো বই। বিশেষ কোন কালিতে লেখা, তাই লেখাগুলো এখনও স্পষ্ট। বইটার মলাটের পরের পাতাতেই তাঁর নিজের হাতের স্বাক্ষর। বোঝাই যাচ্ছে, তিনি মনেপ্রাণে অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। ফ্রান্সিস রাজাকে জিজ্ঞেস করল, 'উনি আর কিছু লেখেন নি' ?

—'না।' রাজা বললেন, তবে বংশপরাম্পরায় একটা কথা চলে আসছে যে, উনি নাকি 'নিউ টেস্টামেণ্ট'ও অনুবাদ করেছিলেন। তবে সেই বইটা আমরা এখনও কেউ চোখে দেখি নি।'

ফ্রান্সিস বইটা ভালো করে দেখলো। প্রাচীন পুঁথি যেমন হয়, বৈশিষ্ট্যহীন। তিনি একজন ধার্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনিই প্রথম তাঁর তৈরী গীর্জার জন্যে য়ুরোপ থেকে ধর্মযাজক আনিয়েছিলেন। কাজেই খৃষ্ট ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফ্রান্সিস ঘুরে-ঘুরে জিনিসপত্রগুলো দেখলো। কিন্তু গুপ্তধনের সূত্র পাওয়া যেতে পারে, এমন কিছু দেখলো না। তবু বইটার গুরুত্বকে ফ্রান্সিস মনে-মনে স্বীকার করলো। নরওয়ের ভাষায় অনুবাদ, কাজেই পড়তে অসুবিধে হবে না।

ও রাজাকে বললো, 'একটা বিনীত নিবেদন ছিল আপনার কাছে।'

—'বলুন।'

—'আমি কয়েকদিনের জন্যে বইটা নিতে পারি।'

রাজা একটু ভাবলেন। বললেন, 'দেখুন, এই ঘরের সব জিনিসই আমরা সযত্নে রাখি। কাউকে কিছু দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তবে—' একটু থেমে রাজা বললেন, 'আপনি আমার অতিথি। একটা গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন। সুতরাং আপনাকে সর্ব-প্রকার সাহায্য করা আমার কর্তব্য।'

ফ্রান্সিস বললো, 'দেখুন বইটা কতটা আমার কাজে লাগবে, তা এখনই বলতে পারছি না। তবে কোথায়-কীভাবে কোন্ সূত্র পাবো, তা এখনই বলা যায় না। চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া—এই আর কি।'

—'বেশ, আপনি কয়েকদিনের জন্য নিন। তবে আর কাউকে নয়, আমার হাতেই ফেরৎ দেবেন'।

—'হ্যাঁ, আপনাকেই দেবো।'

রাজা বইটা ফ্রান্সিসের হাতে দিলেন। বইটা নিয়ে ওরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এলো। হ্যারি বিছানায় বসতে-বসতে বললো, 'হঠাৎ বইটা নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন ?'

ফ্রান্সিস হেসে বললো, 'জানো তো আমাদের দেশের প্রবাদ—'কোন কিছুকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করো না, এমন কি ধুলোকেও নয়।' দেখাই যাক না কোন আলোর কিছু সন্ধান পাই কি না ? তা'ছাড়া বাইবেল অনেক দিন পড়া হয় নি। পড়লে একটু পুণ্যার্জন তো করা হবে!'

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর হ্যারি শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস প্রদীপের আলোয় এরিক দ্য রেডের নিজের হাতের লেখা বাইবেলটা পড়তে লাগলো। পড়তে-পড়তে বুঝল— তাঁর বেশ সাহিত্যজ্ঞান ছিল। অনুবাদের ভাষা যথেষ্ট সাবলীল, অথচ কতদিন আগের লেখা। অনেক রাত পর্যন্ত বইটা পড়ে রেখে দিলো।

পরের দিনই বইটা পড়া শেষ হ'লো। হ্যারি বললো, 'কী হে কেমন লাগলো?'

—'খুব স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। শুধু ধর্মজ্ঞানই নয়, তাঁর সাহিত্যজ্ঞানও ছিলো প্রসংশনীয়। তুমি পড়বে?'

—'দাও পাতা ওল্টাই। সময় তো কাটবে।'। হ্যারি বইটা নিয়ে পড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ পড়ার পর বইটার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে ডাকলো, 'ফ্রান্সিস?'

—'হুঁ।' ফ্রান্সিস তখনও একনাগাড়ে পায়চারী ক'রে চলেছে।

—'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো?'

—'কী ব্যাপার?'

—'প্রত্যেকটি অধ্যায়ের আরম্ভের অক্ষরটা লাল রঙের মোটা অক্ষরে লেখা।'

—'বোধহয় সে আমলে এ-রকম রীতিই ছিলো।'

—'বেশ, তা' ঠিক হ'ল। কিন্তু অন্য কালিতে লেখা কেন?'

—'হুঁ।। আচ্ছা, দেখো তো আর কিছু বিশেষত্ব আছে কিনা?'

—'দেখা যাক।' হ্যারি একমনে বইটা পড়তে লাগলো।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস প্রদীপ জেবলে এলোমেলোভাবে বইটার পাতা ওল্টাতে লাগলো। একসময় ডাকলো, 'হ্যারি, বইটার বিশেষত্ব কিছু দেখলে?'

হ্যারি ডান হাতের চেটো ওল্টালো, বললো, 'উঁহুঁ।' তারপর বিছানায় কাত হ'য়ে শুলো। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লো। ফ্রান্সিস তখনও বইটার পাতা এলোমেলো-ভাবে ওল্টাচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে হ'ল আচ্ছা লাল অক্ষরগুলো একত্র করলে কি কোন সাঙ্কেতিক কথা পাওয়া যায়। ও তাই করলো। চারটে পরিচ্ছেদের প্রথম অক্ষরগুলো একত্র ক'রে ভাবলো। কিন্তু কোন অর্থ দাঁড়ালো না। হাল ছেড়ে দিয়ে বইটা উল্টো ক'রে রেখে দিলো। প্রদীপ নেভাবার আগে বইটার দিকে আবার তাকালো। ভাবলো, আচ্ছা উল্টো দিক থেকে দেখা যাক। ও আবার বইটা খুললো। এবার উল্টো দিক থেকে প্রথম অক্ষরগুলো মনে-মনে সাজাতে লাগলো। দু'টো শব্দ পেলো, 'যীশুর চরণে।' ফ্রান্সিস ভীষণভাবে চমকে উঠলো। একটা অর্থ তো আসছে।

—'ও হ্যারি, শীগগির ওঠ।' ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে বললো।

হ্যারি উঠে ব'সে চোখ কচ্লাতে বললো. 'কী হলো?'

—'আমি এক-একটা অক্ষর ব'লে যাচ্ছি, তুমি লেখ।'

—'লিখবো? কালি-কলম কোথায়?'

ফ্রান্সিস এদিক-ওদিক তাকালো। তারপর নিজের বিছানার বল্গা হরিণের চামড়াটা তুলে নিলো। চামড়ার উল্টো দিকটা পাতলা। সেদিকটা সাদাটে। বললো, 'এটাতে লেখ।'

—'কিন্তু কালি?'

ফ্রান্সিসকে সাঙখু একটা ছুরি দিয়েছিলো। ওটা ফেরৎ দেওয়া হয় নি। ও

বিছানার পাশ থেকে ছুরিটা নিলো। ছুরিটা দিয়ে নিজের আঙুলের ডগা একটুখানি কাটলো। তারপর ছুরির ডগায় একটু রক্ত মাখিয়ে নিয়ে ছুরিটা হ্যারির দিকে এগিয়ে বললো, 'এটা দিয়ে লেখো।'

—'তোমার যত পাগলামো।'

ফ্রান্সিস কোন কথা না বলে হাসলো। তারপর উল্টো দিক থেকে বইটার পরিচ্ছেদ-ভাগ অনুযায়ী অক্ষরগুলো ব'লে যেতে লাগলো। ছুরির ডগার রক্ত শুকিয়ে গেলে আবার আঙুল থেকে রক্ত নিয়ে দিতে লাগলো। সব অক্ষর লেখা হলো। দুই বন্ধুই ঝুঁকে পড়ল সমস্ত লেখাটার ওপর। স্পষ্ট অর্থ পাওয়া যাচ্ছে, 'যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো।' দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকালো। এরা কল্পনাও করে নি যে, উল্টোদিক থেকে অক্ষরগুলো সাজালে একটা অর্থ বেরিয়ে আসবে। অথচ তাই হলো। ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠলো। বললো, 'হ্যারি, একেবারে অন্ধকারে ছিলাম। একটু আলোর আভাস পেয়েছি।'

—'কিন্তু কথাটা আমাদের কোন কাজে লাগবে?' হ্যারি বললো।

—'লাগবে-লাগবে। আজ না হয়, কাল। আসল কথা এরিক দ্য রেড সূত্র রেখে গেছেন। সেইটাই বুদ্ধি খাটিয়ে বের করতে হবে।'

—'তুমি কি এই কথাটাকে একটা সূত্র মনে কর?'

—'নিশ্চয়ই। নইলে অক্ষরগুলোকে এভাবে সাজিয়ে ব্যবহার করা হবে কেন? এটা অনেক ভেবেচিন্তেই করা হয়েছে।'

—'হুঁ।' হ্যারি আর কোনো কথা বললো না।

ফ্রান্সিস বললো, 'একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্ম-বিশ্বাসী। রাজবাড়ি নয়, গীর্জাটাই হবে আমাদের লক্ষ্য। সমাধানের সূত্র আছে গীর্জাটাতেই, অন্য কোথাও নয়'।

—'হুঁ, কথাটা চিন্তা করবার।' হ্যারি বললো।

ফ্রান্সিস আবার লেখাটার দিকে ঝুঁকে পড়ে ভালো ক'রে পড়লো, 'যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো'। বইটার পাতাগুলো এলোমেলো ওল্টালো। কিন্তু আর কিছু বিশেষত্ব দেখলো না। পরদিনই ফ্রান্সিস নেসাক'কে দিয়ে রাজাকে খবর পাঠালো। মন্ত্রণাঘরেই রাজা ওদের সঙ্গে দেখা করলেন। ফ্রান্সিস বইটা ফেরৎ দিয়ে বললো, 'একটা ক্ষীণ সূত্র পেয়েছি বইটা থেকে।'

—'সত্যি?' রাজার মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হলো।

ফ্রান্সিস তখন বইটার উল্টো দিক থেকে অক্ষর সাজিয়ে কীভাবে একটা অর্থপূর্ণ কথা পেয়েছে সে-সব বললো। রাজা বেশ আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'অবাক কাণ্ড! আমরা তো কতদিন বইটা দেখে আসছি। কিন্তু এভাবে তো ভাবি নি। আপনি যে কত বুদ্ধিমান, সেটা এতেই বোঝা গেলো।'

ফ্রান্সিস বললো, 'আমার মনে হয়, গীর্জাটাতেই আমরা সাবধানের সূত্র পাবো। যীশুখৃষ্ট এবং খৃষ্টধর্মের সঙ্গে কিছু যোগ আছে, এই ধনভাণ্ডার গোপন রাখার ব্যাপারে।'

—'দেখুন চেষ্টা ক'রে। তবে যা করবার তাড়াতাড়ি করবেন'। রাজা বললেন।

—'কেন মহারাজ—' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো।

—'আমাদের চিরশত্রু ইউনিপেড্‌দের আক্রমণের আশঙ্কা করছি।'

—'বলেন কি?'

—'হ্যাঁ। আমাদের গুপ্তচর সংবাদ এনেছে, উত্তরদিকে ওদের মধ্যে যুদ্ধের আয়োজন চলছে। ওরা শ্লেজগাড়ি, অস্ত্র এ-সব সংগ্রহ করছে। যে কোনদিন আমাদের আক্রমণ করতে পারে।'

—'হুঁ। দেখি কাল থেকেই আমরা কাজে নামছি।'

—'তাই করুন। ওদের রাজা এভাল্ডাসন অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির লোক। বছর কয়েক হ'ল রাজা হ'য়েছে। এই বাট্টাহালিড জয় করার উদ্দেশ্য একটাই, এরিক দ্য রেডের গুপ্ত ধনভান্ডার উদ্ধার করা। ওরা অসভ্য বর্বর। ওরা পাহাড়ের গুহায় নয়তো মাটিতে গর্ত ক'রে থাকে।' এই হিংস্র মানুষদের দয়া-মায়া ব'লে কিছু নেই'।

রাজা বললেন। ফ্রান্সিস আর কিছু বললো না। নিজের আস্তানায় ফিরে এল। হ্যারি তখন বেড়াতে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। বললো, 'রাজাকে সব বলেছো।'

—'হ্যাঁ।'

—'কি বললেন রাজা'।

—'খুব খুশী হলেন। কিন্তু হ্যারি?'

ফ্রান্সিস একটু থেমে বললো, 'একটা বিপদের সূচনা লক্ষ্য করছি।'

—'কি বিপদ? হ্যারি জিজ্ঞাসা করলো।

ফ্রান্সিস রাজামশাইয়ের আশঙ্কার কথা বর্বর ইউনিপেড্‌দের কথা সব বললো।

—'তা'হলে এখন কি করবো?' হ্যারি চিন্তিত স্বরে বললো।

—'আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে যাবো। চলো কাল থেকেই লাগবো।'

—'বেশ—' হ্যারি মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো।

* * *

পরদিন ফ্রান্সিস নেসার্ককে দিয়ে একটা মশাল আনালো। বাইরে আজকে আকাশটা কিছু পরিষ্কার। তবু গীর্জার ভেতরের অন্ধকারে এই আলোয় দেখা যাবে না। ভালোভাবে সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে হ'লে আরো একটা মশাল চাই।

নেসার্ককে সঙ্গে নিয়ে ওরা গীর্জার দিকে চললো। কতদিনের পুরানো গীর্জা। কালো-কালো পাথরে শ্যাওলা ধ'রে গেছে। কবরখানা পেরিয়ে ওরা গীর্জার সামনে এসে দাঁড়ালো। বিরাট শ্লেটপাথরের দরজা। দরজায় মস্ত বড় একটা তালা ঝুলছে। নেসার্ক কোমরে ঝোলানো একটা লম্বা পেতলের চাবি বের করলো। ও যখন তালা খুলছে, তখন ফ্রান্সিস বললো, 'গীর্জাটা দেখাশুনা করবার কেউ নেই'?

—'একজন যাজক ছিলেন। তিনি বছর খানেক হলো মারা গেছেন। রাজামশাই নরওয়ে থেকে একজন নতুন যাজক আনার জন্য চেষ্টা করছেন।'

দরজা খোলা হ'ল। বেশ জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলতে হ'ল। ওরা ভেতরে ঢুকলো। অন্ধকার ভেতরটা। নেসার্ক চকমকি ঠুকে মশালটা জ্বাললো। মশালের আলোয় বেশ পরিষ্কার দেখা গেলো চারিদিক। পাথরের বেদীটা লাল সাটিনের কাপড়ে ঢাকা। ঢাকনাটায় হলুদ সুতোর কাজ করা। তা'তে ঝালর লাগানো।

পেছনের গলি জানালায় রঙীন কাঁচ। পাথরের বেদীটার ওপর একটা কাঠের বেদী। তার ওপর ক্রুশবিদ্ধ যীশুর বেশ বড় পেতলের মূর্তি। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মুখে ক্ষার হাসি। মাথাটা একটু ঝুঁকে পড়েছে। চোখ দু'টো খুব সজীব, এক পাশে তাকিয়ে আছেন। "যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো—" কথাটা মনে হতেই ফ্রান্সিস যীশুর মূর্তিটার পায়ের দিকে তাকালো। দেখলো, যীশুর পায়ে পেরেক পোঁতা। ক্রুশের কাঠটা নীচের কাঠের বেদীটার মধ্যে ঢোকানো। ঐ কাঠটাই মূর্তিটার ভারসাম্য রক্ষা করছে। ফ্রান্সিস কাঠটা, কাঠের বেদীটা ভালো ক'রে দেখলো। কিন্তু কিছুই বিশেষত্ব পেল না। ফ্রান্সিস দেখছে, তখনই মশালের আলোটা আড়াল পড়ে গেলো। ও দেখলো, যীশুর মূর্তিটার পিছনে মেঝের কাছাকাছি এক কোণের দেওয়ালে একটা লোহার আংটা বেরিয়ে আছে। নেসার্ক তাতে মশালটা রেখেছে। ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্য হলো। অত নীচে মশাল রাখবার আংটা? আলো তো ঢাকা পড়ে যাবে।

নেসার্ককে বললো, 'অত নীচে মশাল রাখলে আলো তো ঢাকা পড়ে যাবে।'

নেসার্ক বললো, 'ওটা মশাল রাখারই আংটা। বরাবর উৎসবের দিনে ওখানেই মশাল রাখা হয়। এরিক দ্য রেডের আমল থেকে নাকি তা চলে আসছে। ও'পাশের দিকটা দেখিয়ে বললো, ও-দিকেও ঠিক এ-রকম একটা আংটা আছে। ফ্রান্সিস সেদিকে লক্ষ্য ক'রে দেখলো, ঠিক ও-রকমই একটি আংটা মেঝের কাছাকাছি দেয়ালে গাঁথা। হ্যারির দিকে ফিরে বললো, 'হ্যারি, ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত লাগছে না? অত নীচে মশাল রাখবার আংটা?'

—'হুঁ। হয়তো আগে কিছু রাখা হ'ত, এখন মশাল রাখা হয়।'

—'আগে কী রাখা হ'ত?'

—'এ-বিষয়ে আমরা সবাই অন্ধকারে। কারণ, ব্যাপারটা আজকের না, অনেকদিন আগের।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'ঠিক। তবে ব্যাপারটা অদ্ভুত।'

দু'জনে আর কিছুক্ষণ গীর্জাটার ভেতরে ঘোরাঘুরি করলো মনোযোগ দিয়ে সব কিছু দেখলো। তারপর আস্তানার দিকে ফিরে আসতে, তখনই একটু দূরে উত্তর-দিকে পাহাড়টা দেখলো ফ্রান্সিস। এসে অবধি সব জায়গা দেখা হ'য়েছে, কিন্তু পাহাড়টা দেখা হয়নি। ও নেসার্ককে ডাকলো, 'নেসার্ক?'

—'বলুন?'

—'ঐ পাহাড়টার কী নাম?'

—'সাক্কারটপ পাহাড়।'

—'কত উঁচু?'

—'খুব বেশী নয়।'

—'ও!'

—'পাহাড়টার ও'পাশেই নিচের দিকে আমার টুপিক।'

—'চলো, তোমার টুপিক কালকে দেখতে যাবো।' হ্যারি বললো।

—'বেশ তো। আপনারা গেলে আমাদের বুড়ো বাবা-মাও খুব খুশী হ'বে। নেসার্ক বললো।

* * *

পরের দিন দু'টো স্লেজগাড়িতে চড়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারি চললো পাহাড়টার ও'পাশে। সঙ্গে নেসার্ক। পাহাড়টাকে বাঁ দিকে রেখে ওরা ঘুরে ওপাশে গেলো। দূর থেকেই থেকেই নেসার্কের টুপিক দেখা গেলো। আজকের দিনটা অন্যদিনের চেয়ে বেশ উজ্জ্বল। সাদা বরফের পাহাড়টা থেকে যেন আলো ছিটকে পড়ছে। আজকে শীতটাও একটু কম। খুব ভালো লাগছিলো ফ্রান্সিসের।

ওরা নেসার্কের টুপিকের সামনে এসে গাড়ি থামালো।

টুপিকের বাইরে দড়িতে হরিণের চামড়া শুকোতে দেওয়া হ'য়েছে, এস্কিমোদের তাঁবু যেমন হ'য়ে থাকে। নেসার্কের বাবা-মা বেরিয়ে এলো টুপিক থেকে। ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে ওরা জড়িয়ে ধরলো। এস্কিমোদের ভাষায় কি যেন বলতে লাগালা। নেসার্ক হেসে বললে, বাবা-মা বলছে, 'আমাদের গরীবের টুপিক। আপনাদের উপযুক্ত সমাদর করতে পারবো না বলে কিছু মনে করবেন না যেন।'

ওদের টুপিকের মধ্যে বিছানায় বসতে বললো। ওরা দু'জনে বসলো। সকালেই নেসার্কের মা ওদের জন্য বল্গা হরিণের মাংস রেঁধে রেখেছিলা। তাই খেতে দিলো সঙ্গে রুটি। এত সুস্বাদু হ'য়েছে রান্না, যে এক-বাটি মাংস ফ্রান্সিস এক লহমায় খেয়ে নিলো।

হ্যারি ওর কান্ড দেখে হাসলো। তারপর নিজের বাটি থেকে কিছুটা মাংস আর ঝোল ওর বাটিতে ঢেলে দিলো। নেসার্ক অবশ্য বলতে লাগলো, 'আরে মাংস আছে। আপনারা পেট ভ'রে খান।'

কিন্তু ফ্রান্সিস লজ্জায় চাইতে পারলো না।

খাওয়া-দাওয়া পর ওরা চারপাশটা একটু ঘুরে-ফিরে দেখলো। দেখবার কিছুই নেই। শুধু বরফ আর বরফের বিরাট-বিরাট চাঁই পাহাড়টার গা'য়।

'বিদায় দেবার সময় ফ্রান্সিস নেসার্কের বাবা-মা'র হাত ধরে বার-বার বললো, 'কুয়অনকা! কুয়অনকা!'

এস্কিমোদের ভাষার এই শব্দটাই ও কানে শুধু। নেসার্ককে বললো, 'তুমি এ-রকমভাবে তোমাদের বসতি থেকে দূরে থাকো কেন?'

নেসার্ক হেসে আঙুল দিয়ে পাহাড়টা দেখালো। বললো, 'জ্যোৎস্না রাত্রে এই পাহাড়ের রূপ দেখেন নি। সে-যে কী অপরূপ দৃশ্য। টুপিকের ফাঁক দিয়ে সেই দৃশ্য দেখি। মনে হয়, সমস্ত পাহাড়টা যেন একটা বিরাট হীরের খন্ড। মৃদু আলো ঠিকরোয় বরফের চাঁইগুলো থেকে। আমার কাছে এই সবকিছু ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে হয়। আপনারা হয়তো আমাকে পাগল ঠাওরাবেন কিন্তু—'

—'না নেসার্ক। তুমি যা বলেছো, তা মিথ্যে নয়। তোমার মতো দেখার চোখ, আর অনুভবের মন পাওয়া ভাগ্যের কথা।' ফ্রান্সিস নেসার্কের কাঁধে হাত রেখে কথাগুলো বললো।

নেসার্ক টুপিকেই থেকে গেল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি একটা স্লেজগাড়ি চড়ে বাট্টাহালিডে ফিরে এলো।

ফ্রান্সিসদের দিন কাটতে লাগলো। ও নেসার্কের কাছ থেকে গীর্জার চাবিটা নিয়ে

রেখেছে। কখনো হ্যারিকে নিয়ে, কখনো একা গীর্জাটায় ঢোকে। চারিদিক ঘুরে-ঘুরে দেখে—হয়তো এই গীর্জার নীচেই লুকনো আছে গুপ্তধন। কিন্তু কোথায়? পায়চারী করে আর ভাবে—কোথায়, কিভাবে লুকনো আছে সেই গুপ্তধন? কিন্তু ভেবে-ভেবে কুল-কিনারা পায় না। আর কোন নতুন সূত্রও পায় না।

রাজা সোক্কাসন মাঝে-মাঝে ডেকে পাঠান, জিজ্ঞাসা করেন—'অনুসন্ধানের কাজ কেমন চলছে? ফ্রান্সিস বলে, 'চেষ্টা করছি, কিন্তু কোন সূত্র পাচ্ছি না।'

একদিন ফ্রান্সিস রাজাকে জিজ্ঞেস করল—'এরিক দ্য রেডের লেখা আর কোন বই আপনার যাদুঘরে আছে?'

'না। তবে শুনেছি, উনি 'নিউ টেস্টামেণ্ট'ও অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু সেই বইখানা আমরা কেউ চোখে এখনও দেখি নি।'

* * *

এভাবেই ফ্রান্সিসদের দিন কাটতে লাগলো।

এর মধ্যেই একদিন ভোরবেলা রাস্তায় লোকজনের খুব হৈ-হৈ ডাকাডাকি শোনা গেল। ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও বাইরে এসে দেখলো, দলে-দলে এস্কিমোরা, রাজার সৈন্যরা কুঠার, বর্শা হাতে পাহাড়টার দিকে চলেছে। হ্যারিরও ঘুম ভেঙে গেল। ও এসে ফ্রান্সিসের পাশে দাঁড়ালো। কী ব্যাপার, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

একটু পরেই নেসার্ক এলো। ওরও হাতে কুঠার, ও হাঁপাচ্ছিল। বললো, গুপ্তচর খবর নিয়ে এসেছে, ইউনিপেড্‌রা সাক্কারটপ পাহাড়ের নীচে জড়ো হয়েছে। হয়তো এতক্ষণে আক্রমণ শুরু করেছেন। আপনারা বাইরে বেরোবেন না—রাজা হুকুম দিয়েছেন। আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।'

—'ওদের কি লোকজন বেশী?' ফ্রান্সিস জানতে চাইলো।

—'হতে পারে। এর আগে দু'-দু'বার আমরা ওদের হঠিয়ে দিয়েছি। এবার তাই হয়তো বেশী লোকজন নিয়ে এসেছে'।

নেসার্ক আর দাঁড়ালো না। ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত শ্লেজগাড়িতে উঠে পড়লো। একটু বেলা হতেই যুদ্ধক্ষেত্রের কোলাহল এখানে এসেও পেঁছাতে লাগলো। সন্দেহ নেই, মরণপণ যুদ্ধ চলেছে।

হ্যারি ডাকলো, 'ফ্রান্সিস?'

—'উঁ?'

—'এখন কী করবে?'

—'সন্ধ্যেনাগাদ যুদ্ধের ফলাফল আঁচ করা যাবে। তখন ভাববো।'

'সন্ধ্যেনাগাদ যুদ্ধের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এলো। রাত নেমে আসতে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। দু'টো একটা করে শ্লেজগাড়ি আহত-নিহতদের নিয়ে ফিরতে লাগলো। রাজবাড়ির বাইরের সব ঘরে আহতদের রাখা হলো। অনেক রাত পর্যন্ত আহতদের আর্তনাদ শোনা গেল।

তখন গভীর রাত, হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ। ফ্রান্সিসের আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ও আস্তে-আস্তে হ্যারিকে ধাক্কা দিল। ঘুম ভেঙে হ্যারি উঠে বসলো। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে বললো, 'তরোয়ালটা হাতে নিয়ে তৈরী থাকো।' তারপর

নিজে তরোয়াল হাতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তখনও দরজায় ধাক্কা দেওয়ার বিরাম নেই। ফ্রান্সিস বললো, 'কে ?'

—'আমি—আমি নেসার্ক।' নেসার্ক হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল।

ফ্রান্সিস দরজা খুলে দিল। নেসার্ক ঘরে ঢুকেই বললো, 'চলো, আগে রাজামশাই কী বলেন শুনি'।

দু'জনে নেসার্কের পিছু-পিছু রাজবাড়ির সামনে এলো। অল্প জ্যোৎসনায় ওরা দেখলো, অনেকগুলো শ্লেজগাড়ি সাজানো হয়েছে। এসব কাজ চলেছে নিঃশব্দে। মশলও জ্বালানো হয়নি। বল্‌গা হরিণ-টানা একটা শ্লেজগাড়িতে রাজা-রানী বসে আছেন। রানীর কোলে ঘুমন্ত শিশু রাজকুমার। ওরা মাথা নুইয়ে রাজা-রানীকে সম্মান জানালো। রানীকে আগে ফ্রান্সিস দেখেছিল। কী সুন্দর উজ্জ্বল ছিল তাঁর রূপ। আজকে দেখলো মলিন মুখ বিমর্ষ, চিন্তাক্লিষ্ট।

রাজা ফ্রান্সিসকে কাছে ডাকলেন। কেমন ভগ্নস্বরে বললেন, 'দেখুন, যুদ্ধ আমাদের অনুকূলে নয়। আমার প্রজারা আমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। তারা প্রাণপণ যুদ্ধ করছে করবেও, কিন্তু আমাদের জয়ের কোন আশা নেই। আমরা কোর্টফেজে আশ্রয় নিতে যাচ্ছি। আপনাদের জন্যে গাড়ী তৈরী রাখা হয়েছে, আসুন।'

ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে বললো, 'না মহারাজ, আমরা এখানেই থাকবো। ইউনি-পেড্‌দের সঙ্গে আমাদের তো কোন শত্রুতা নেই।'

—'তা' হলেও ওরা হিংস্র বর্বর। সভ্য রীতি ওরা মানে না।'

—'মহারাজ, কব্জির জোরে নয়, বুদ্ধির জোরেই আমরা বেঁচে থাকবো। ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

রাজা সোক্কাসন ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলেন। ওদিকে রাজা ও অমাত্যদের পরিবারের লোকজন নিয়ে অন্য গাড়িগুলো রওনা হতে শুরু করেছে। রাজা সেদিকে একবার তাকালেন। তারপর ফ্রান্সিসসের দিকে ফিরে বসলেন, দেখুন আমি আপনাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবার সব বন্দোবস্ত করেছিলাম। কিন্তু আপনারা রাজী হলেন না। এরপরে আপনাদের যদি কোন ক্ষতি হয়, তার জন্যে আমাকে দায়ী করবেন না।'

—'না মহারাজ। আমরা নিজেদের দায়িত্বেই এখানে থাকছি।'

—'বেশ।' রাজা গাড়ি-চালককে ইঙ্গিত করলেন।

বল্‌গা হরিণে-টানা গাড়ি বরফের ওপর দ্রুতবেগে ছুটলো। অন্য গাড়িগুলোও ছুটলো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের ঘরে ফিরে এলো। দু'জনেই আর ঘুমুতে পারলো না। হ্যারি একসময় বললো, 'এভাবে থেকে যাওয়াটা কী ভালো হলো' ?

—'পালিয়ে গিয়েই বা কী হতো ? অলস সময় কাটাতাম শুধু। কিন্তু এখানে থাকলে গুপ্তধনের খোঁজে চালিয়ে যেতে পারবো।'

—'কিন্তু ইউনিপেড্‌রা কি আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে ?

—'দেবে, কারণ ওদের রাজা এভান্ডাসনের লক্ষ্য এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন। আমরা ওর এই ধনলিপ্সাটাকেই কাজে লাগবো। আমরা সেই ধনভাণ্ডার খুঁজে দেবো, এই শর্তে আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

—'হু' কথাটা ঠিক। কিন্তু এভাল্ডসন কেমন লোক, তা এখনও জানি না।'

—'দেখা যাক।' এই সব কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বাকী রাতটুকু কেটে গেল।'

* * *

পরের দিন সকাল থেকেই আবার হৈ-হল্লা। যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যেতে লাগল সৈন্যরা।

দুপুর নাগাদ আহত-নিহত সৈন্যদের নিয়ে গাড়ি ফিরতে লাগল। তার পেছনেই দলে-দলে ইউনিপেড্রা বাট্টাহালিডে ঢুকতে লাগল। বোঝাই গেল, রাজা সোক্কাসনের সৈন্যরা হেরে গেছে। ফ্রান্সিস ও হ্যারি এই প্রথম ইউনিপেডদের দেখলো। এস্কিমোদের মতই পোষাক ওদের। তবে অত্যন্ত নোংরা আর ছেঁড়াখোড়া। মুখে-হাতে কাদা মাখা, ঘাড় মাথা-ঢাকা নোংরা টুপীর মত। মাথায় খোঁচা-খোঁচা চুল তারই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে। চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওরা হিংস্র। ওদের হিংস্রতার নমুনা ফ্রান্সিস আর হ্যারি দেখলো। আহত এস্কিমোদের একটা গাড়ী রাস্তার পাশে ছিল। ইউনিপেড্রা চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই গাড়ির ওপর। কুঠার চালিয়ে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলতে লাগল সেই আহতদের। তাদের করুণ চীৎকারে আকাশ ভরে উঠলো। আর একদল ইউনিপেড্ কুঠার আর বল্লম হাতে কাছাকাছি টুপিকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নারি শিশুদের কান্নার রোল উঠলো। ওরা বোধ হয় কাউকে বেঁচে থাকতে দেবে না। নির্বিবাদে হত্যা করবে সবাইকে। শ্মশান করে ছাড়বে বাট্টাহালিড্কে।

ফ্রান্সিসরা দরজা বন্ধ করে সরে এল। বিছানায় বসলো না, পায়চারী করতে লাগলো। ওদিকে বিজয়ী ইউনিপেড্দের হৈ-হল্লা চীৎকার চলেছে। এক সময় হঠাৎ ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়লো। চিন্তিতস্বরে ডাকল, 'হ্যারি।'

—'বলো।'

—'আমরা কি ভুল করলাম?'

হ্যারি বিছানায় বসেছিল, এবার উঠে এসে ফ্রান্সিসের মুখোমুখি দাঁড়ালো। দৃঢ়স্বরে বললো, 'তুমি এই চিন্তাকে একেবারে প্রশ্রয় দিও না। আমরা যা করেছি, ঠিক করেছি। মনটা শক্ত করো।'

ফ্রান্সিস বুঝলো, হ্যারি ঠিক কথায় বলেছে। এখান থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তের পর, আর পালানোর প্রশ্ন ওঠে না। তা-ছাড়া এখন আর পালাবার উপায়ও নেই।

বাইরের হৈ-হল্লা সামনে চলেছে, তখন হঠাৎ দরজায় প্রচণ্ড জোরে লাথি পড়তে লাগল। শ্লেটপাথরের দরজা, ভেঙে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দু'জনেই তাড়াতাড়ি তরোয়াল তুলে নিল। তারপর ফ্রান্সিস পায়ে-পায়ে এগিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েই ঝট্ করে পেছিয়ে এলো। দু'জন ইউনিপেড্ হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো।

ফ্রান্সিস নরওয়ের ভাষায় চীৎকার করে বললো, 'কী চাই?'

ওরা এতক্ষণে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ওরা এস্কিমোদের দেখবে ভেবেছিল, দেখলো দু'জন য়ুরোপীয়ানকে। একজনের হাতে একটা রক্তমাখা কুঠার, অন্যজনের হাতে বর্শা। ফ্রান্সিসের কথা ওরা কিছুই বুঝল না। দু'জনে একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। তারপর কুঠারহাতে লোকটাই প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়ল ফ্রান্সিসের ওপর।

ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে তরোয়াল চালালো। কিন্তু তরোয়ালটা ওর বুক ছুঁয়ে গেল। চামড়ার নোংরা পোষাকটা দোফালা হয়ে গেল।

ওদিকে অন্য লোকটা হ্যারিকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল। হ্যারি ঝট্ করে বসে পড়লো। বর্শাটা ওর মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে পাথুরে দেয়ালে লেগে ঝনাৎ করে পড়ে গেল মেঝের ওপর। ওদিকে কুঠারহাতে লোকটা ফ্রান্সিসের লক্ষ্য করে কুঠার চালালো। কিন্তু ভারী কুঠার নিয়ে তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করা যায় না; ফ্রান্সিস সেই সুযোগটা নিল। ঝট্ করে মাথা সরিয়ে কুঠারের ঘা'টা এড়িয়ে, একমুহূর্ত দেরী করল না। নীচু হয়ে সোজা তরোয়াল বসিয়ে দিল লোকটার বুকে।

লোকটা 'অঁক' করে একটা শব্দ তুলে চিৎ হয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল। তারপর গোঙাতে লাগল। ওদিকে বর্শা হাতছাড়া হওয়ায় অপর লোকটি খালি হাতে দাঁড়িয়ে রইল। একবার দরজার দিকে তাকালো, অর্থাৎ পালাবার ধান্দা। কিন্তু ফ্রান্সিস ওকে সেই সুযোগ দিল না। ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার ওপর। তারপর লোকটার পেটে তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল। লোকটা মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে গোঙাতে লাগল। আগের লোকটি তখন মরে গেছে। ফ্রান্সিস জোরে শ্বাস ফেলে বললো, 'দু'টোকেই বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে হবে।'

ওরা তাই করল। লোক দু'টোকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বাইরে বরফের ওপর ফেলে দিল। অত লোকজনের ছুটোছুটি হৈ-হল্লার মধ্যে কারো নজরে পড়লো না ব্যাপারটা।

ওরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সারাটা দিন আর কেউ ওদের ঘরের দিকে এলো না। কিন্তু সন্ধ্যের পর ওদের দরজার সামনে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শুনলো ওরা। দরজা একটু ফাঁক করে দেখলো, একদল ইউনিপেড অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মশালহাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোধহয় রাজবাড়ির ঘরগুলোতে হানা দিতে বেড়াচ্ছে।

বিছানায় বসল দু'জনে। খুব চিন্তিত স্বরে ফ্রান্সিস হ্যারিকে বললো, 'এখন কী করা যাবে?'

হ্যারি বললো, 'অতলোকের মোকাবিলা করতে যাওয়া বোকামি। লড়াই নয়, বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁচতে হবে।'

হ্যারির কথা শেষ হতে না হতেই দরজায় দমাদ্দম লাথি পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে দরজায় ধাক্কা। ফ্রান্সিস এগিয়ে দরজা খুলে পেছিয়ে দাঁড়ালো। ইউনিপেড্‌রা মশাল হাতে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। কারোর হাতে বর্শা, কারোর হাতে কুঠার। মশালের আলোয় ওদের ভাবলেশহীন কাদা মাখা মুখ বীভৎস লাগছে দেখতে। ওরা ফ্রান্সিসদের দেখে একটু অবাক হলো।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বললো, 'হ্যারি তরোয়াল ফেলে দাও।'

দু'জনেই তরোয়াল ফেলে দিল। পাথরের মেঝেতে শব্দ হলো—ঝনাৎ—ঝনাৎ। ওরা যে যুদ্ধ চায় না, বরং আত্মসমর্পণ করছে, ফ্রান্সিস এটা ওদের বোঝাল। ওদের মধ্যে থেকে একজন বলশালী চেহারার লোক এগিয়ে এসে এস্কিমোদের ভাষায় কী বলল। সবটুকু না বুঝলেও ফ্রান্সিস বুঝল, ও বলতে চাইছে, তোমরা এখানে কী করছো? ফ্রান্সিস চীৎকার করে নরওয়ের ভাষায় বললো, 'আমরা রাজা এভান্ডাসনের

সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ফ্রান্সিস বারবার কথা বলতে লাগল, আর রাজা এভাল্ডাসন শব্দটার ওপর জোর দিতে লাগল। ওরা ফ্রান্সিসের কথা না বুঝলেও রাজা 'এভাল্ডাসন' শব্দটা বুঝল ওদের মধ্যে দু'একজন দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলে উঠে কুঠার তুলে ধরল। বলশালী লোকটা হাত তুলে ওদের নিরস্ত করল। তারপর একজনের হাত থেকে দড়ি নিয়ে এগিয়ে এলো। ফ্রান্সিস আবার চীৎকার করে বললো, 'রাজা এভাল্ডাসনের সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই।'

এদিকে বলশালী লোকটা ও আর একজন মিলে, ফ্রান্সিস ও হ্যারির হাত পিছমোড়া করে বেঁধে তারপর ফ্রান্সিসকে দরজার দিকে ধাক্কা দিল।

ফ্রান্সিস রাগে ফুঁসতে লাগলো। কিন্তু এখন এই পরিবেশে মাথা গরম করা বোকামি। এখন বাঁচতে হবে।

* * *

ইউনিপেড্‌দের দল ওদের নিয়ে চললো। রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকল ওরা। তারপর সভাগৃহে ঢুকল। ফ্রান্সিস দেখলো, অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। রাজার পাথরের বেদীমত আসনটায় কে মোটামত একটা লোক হাত-পা ছাড়িয়ে বসে আছে। ফ্রান্সিস বুঝল, এই লোকটাই ইউনিপেড্‌দের রাজা—'এভাল্ডাসন'। রাজার পরণেও নোংরা পোষাক। মুখটা বেশ ভারী। কপালের ওপর খোঁচা-খোঁচা চুল নেমে এসেছে। মুখে সামান্য দাড়ি-গোঁফ। কুত্‌কুতে চোখ। দেখলো, রাজা একটা বল্‌গা হরিণের আস্ত ঠ্যাং থেকে মাংস ছাড়িয়ে খাচ্ছে। রাজার আসনের পাশেই একটা রক্তমাখা কুঠার পড়ে আছে। সেই বলশালী লোকটা এক নাগাড়ে কী ব'লে যেতে লাগলো, আর রাজামশাই কুত্‌কুতে চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগলো। লোকটার কথা শেষ হ'লে রাজামশাই মাংস খাওয়া থামিয়ে চীৎকার ক'রে কী ব'লে উঠলো। দু-তিনজন ইউনিপেড্‌ ছুটে এসে ফ্রান্সিসদের ধাক্কা দিতে লাগলো। ফ্রান্সিস বুঝলো না, রাজা কী আদেশ দিলো। তবে এটা বুঝলো, যে বিপদ কাটে নি। ও তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে বললো, 'রাজা এভাল্ডাসন আপনাকে একটা জরুরী কথা বলতে চাই।' এদিকে ইউনিপেড্‌রা ওদের দু'জনকে ঠেলছে আর ফ্রান্সিস একনাগাড়ে কথা কথাটা ব'লে চলেছে ওখানে। কেউই ওর কথা বুঝল। এমন সময় অমাত্যদের আসনে বসা একজন লোক উঠে রাজাকে গিয়ে কী বললো, তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে ভাঙা-ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বললো—'তোমার নাম কি?'

ফ্রান্সিস খুশী হ'ল। অন্তত একজনকে পাওয়া গেল যে নরওয়ের ভাষা বোঝে। তখন উত্তর দিল—'ফ্রান্সিস।'

ফ্রান্সিস এবার লোকটার দিকে তাকালো। দেখলো, একজন অল্প দাড়ি-গোঁফ-ওয়ালা বৃদ্ধ। মুখ-চোখ বেশ শান্ত, যদিও পরণে সেই নোংরা চামড়ার পোষাক।

বৃদ্ধ বললো, 'আমি ইউনিপেড্‌দের মন্ত্রী। একমাত্র আমিই নরওয়ের ভাষা একটু বুঝি, আর একটু বলতে পারি। রাজাকে তুমি কী জরুরী কথা বলতে চাও?'

—'আমরা জাতিতে ভাইকিং।' ফ্রান্সিস বললো, 'আমরা এখানে এসেছি, এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন খুঁজে বের ক'রতে।'

'এরিক দ্য রেডে'র নামটা শুনে রাজা মাংস খাওয়া থামিয়ে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালো।

—'তোমরা কি কোন খোঁজ পেয়েছো ?'

—'না, তবে একটা মূল্যবান সূত্র পেয়েছি।'

রাজামশাই এবার অস্বস্তি প্রকাশ করলো। মন্ত্রীকে ডেকে কি বললো। মন্ত্রীও ঐ ভাষায় কিছু বললো। রাজামশাই ঠ্যাং চিবুনো বন্ধ রেখে কি বলে উঠলো।

মন্ত্রী বললো, 'রাজা এ্যাডাল্ডাসন জানতে চাইছেন, তোমরা কী ধরণের সূত্র পেয়েছো' ?

ফ্রান্সিস ফিস্‌ফিস করে বললো, "হ্যারি ওষুধে কাজ হ'য়েছে।' বোধহয় কতটা কাজ হয়েছে, বোঝার জন্য ফ্রান্সিস বলে উঠলো, 'তার আগে আমাদের হাতের বাঁধন খুলে দিতে হবে।'

মন্ত্রীমশায় বলশালী লোকটাকে কি বললো। দু'জন এসে ওদের হাতের বাঁধন খুলে দিলো। ফ্রান্সিস তখন 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বইয়ের কথা, সাংকেতিক লেখা, এসব ব'লে গেলো।

রাজা অধৈর্য হয়ে বারবার মন্ত্রীকে কি বলতে লাগলো। মন্ত্রী কোন কথা না ব'লে মনোযোগ দিয়ে ফ্রান্সিসের কথা শুনতে লাগলো। কথা শেষ হলে মন্ত্রী রাজাকে ইউনিপেড্‌দের ভাষায় সব ব'লে গেলো। রাজা ঠ্যাং ছুঁড়ে ফেলে সিংহাসনের ওপর এক লাফে উঠে দাঁড়ালো। তারপর চীৎকার ক'রে কি বলে উঠলো।

মন্ত্রী বললো, 'রাজা মশায় বলছেন, 'এরিক দ্য রেডে'র গুপ্তধন তাঁর এক্ষুনিই চাই।'

ফ্রান্সিস মৃদু হাসলো। বললো, 'রাজাকে বলুন, অত তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা সম্ভব হ'লে, অনেক আগেই লোকে উদ্ধার করতো। যাকগে, আমরা আর কোন সূত্র পাই কিনা, সেই চেষ্টায় আছি।

মন্ত্রী রাজাকে তাই বললো। রাজামশাই আবার কি বললো। মন্ত্রী বললো, 'রাজামশাই জিজ্ঞেস করছেন, তোমরা কি পারবে ?'

—'চেষ্টা করবো। তবে, দুটো শর্ত আছে।'

—'বলো।'

—'এক, যে ঘরে আমরা ছিলাম, সেই ঘরে আমাদের থাকতে দিতে হবে। দুই, আমাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দিতে হবে।'

মন্ত্রী রাজাকে সব কথা বললো। রাজা কপালে হাত বুলালো একবার। তারপর কি বললো। মন্ত্রী বললো, 'রাজামশাই আপনাদের শর্তে রাজী হয়েছেন। তবে তাঁরও একটা শর্ত আছে।'

—'সেটা কী ?'

—'তোমরা একজন যখন বাইরে বেরোবে, অন্যজনকে তখন ঘরে থাকতে হবে। দু'জনে একসঙ্গে কোথাও যেতে পারবে না।'

ফ্রান্সিস রাজার মুখের দিকে তাকালো। দেখলো, অল্প-অল্প গোঁফের ফাঁকে রাজা মিষ্টি-মিষ্টি হাসছে। ও বুঝলো, বর্বর অসভ্য হ'লে কি হ'বে, রাজা

এডাল্ডাসন নির্বোধ নয়। ও সেই শর্তে রাজী হ'ল। এখন যা শর্ত দেবে, তাই মেনে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। মন্ত্রী বললো, 'কবে থেকে কাজে লাগবে?'

—'কাল থেকেই।'

রাজা আবার আসনে বসলো। আরো কয়েকজন এস্কিমোদের ধরে আনা হ'য়েছে। এবার তাদের বিচার হ'বে বোধহয়।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের আস্তানায় ফিরে এলো।

* * *

পরের দিন ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস দরজার বাইরে কাদের চলাফেরার শব্দ। ও দরজা খুললো। দেখলো, দু'জন ইউনিপেড্ কুঠার হাতে দরজায় পাহারা দিচ্ছে। তার মানে রাজা এডাল্ডাসন ওদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় নি। হ্যারিকে ডেকে তুলল ও, পাহারার কথা বললো। হ্যারি বললো, 'এসব মেনে নিতেই হবে—উপায় নেই।'

সারাদিন ফ্রান্সিসরা ঘরে বসে কাটালো। বিকেলের দিকে ফ্রান্সিস বেরলো। পাহারাদার দু'জনও ওর সঙ্গে-সঙ্গে চললো। সে গীর্জায় গেল, কোমরে গোঁজা ছিল চাবিটা। ও দরজা খুলে গীর্জায় ঢুকলো, ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল চারিদিক। আজকেও সেই কড়া দু'টো ওর নজর কাড়লো। এত নীচে দু'টো কড়া গাঁথার অর্থ কী? এ-সব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে আবার আস্তানায় ফিরে এলো।

ওদিকে ইউনিপেড্‌রা এসে বাট্টাহালিডের যে-ক'টা পাথরের বাড়ি ছিল, সে-ক'টা রাজবাড়ির ঘরগুলো, যত টুপিক ছিল সব দখল করে নিয়েছে। টুপিকের বাইরে আগুন জেলে ওরা মাংস ঝলসায়, খায় আর অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-হল্লা করে।

সেদিন ওরা দু'জনে বিছানায় বসে আছে। বাইরে যথারীতি পাহারাদার দু'জন পাহারা দিচ্ছে। হ্যারি ডাকল, 'ফ্রান্সিস!'

—'বলো।'

—'আমাদের একজনকে পালাতেই হবে।'

—'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম। দেখ, গুপ্তধন খুঁজছি, এই ধোঁকা দিয়ে বেশীদিন চলবে না। তার আগেই আমাদের কাউকে আঙ্গামাগাসালিকে যেতে হবে—বন্ধুদের নিয়ে আসতে হবে। তারপর কোর্টল্ড থেকে রাজা সোক্কাসনের যত সৈন্য আছে, সবাইকে একত্র করে বাট্টাহালিড আক্রমণ করতে হবে। এখান থেকে ইউনিপেড্‌দের তাড়াতেই হবে।'

—'তাহ'লে তুমিও পালাও—' হ্যারি বললো।

—'পালালে তো আমাকেই পালাতে হবে, তুমি এত ধকল সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু আমি পালালে তোমার না কোন বিপদ হয়।'

—'শোন—' হ্যারি বললো, 'তুমি পালালে আমি বলবো যে, আমি একটা নূতন সূত্র পেয়েছি। রাজা এরিক দ্য রেডের যাদুঘরটা আমাকে ভালো করে দেখতে হবে। প্রত্যেকদিন অনেকক্ষণ ধরে ঐ যাদুঘরে কাটাবো। এভাবে রাজা এডাল্ডাসনের বিশ্বাস অর্জন করবো। যাদুঘরের জিনিসপত্র নাড়া-চাড়া করবো। পাথরের মেঝে খুঁড়তে বলবো, এ-সব করতে-করতে তুমি লোকজন নিয়ে ফিরে আসতে পারবে। তারপর শেষ লড়াই'।

—'হুঁ তুমি বেশ পরিকল্পনাটা করেছ। তাহ'লে কী করবো? কালকেই পালাবো?'

—'হ্যাঁ তাই করো। আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না।'

পরের সারাটা দিন ফ্রান্সিস বা হ্যারি কেউই বেরলো না। সারাদিন এই পরিকল্পনা নিয়েই পরামর্শ করল। একটু রাত হতে ফ্রান্সিস তৈরী হলো। বেশী পোষাক পরলো, বিছানা থেকে হরিণের চামড়াটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়ালো। তরোয়ালটাও নিল। দু'জন-দু'জনকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর ও ঘরের বাইরে এলো। পাহারাদার দু'জন ওর সাজসজ্জা দেখে একটু অবাকই হলো। তবে এও বোধহয় ভাবলো যে ঠাণ্ডার রাত, তাই বেশি পোষাক পরেছে।

ফ্রান্সিস গীর্জার দিকে হাঁটতে লাগল। পাহারাদার দু'জন পেছনে চললো। ওরা তো আর জানে না, সে মনে-মনে কী ফন্দী এঁটেছে?

গীর্জায় পেঁাছে সে চাবি দিয়ে বিরাট তালাটা খুললো। ভেতরে ঢুকে চকমকি ঠুকে মোমবাতি জ্বালল। এটা-ওটা দেখতে লাগল। দরজার বাইরে পাহারাদার দু'জন দাঁড়িয়ে রইল।

একটু রাত হলে, একজন পাহারাদার দরজায় ঠেস দিয়ে বসে ঘুমুতে লাগল। অন্যজন দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস দেখলো, এই সুযোগ। ও আংটায় বসানো একটা মশাল নিয়ে দরজার কাছে এলো। যে লোকটা জেগেছিল, তাকে আকারে-ইঙ্গিতে বোঝালো যে, মশালটা ও জ্বালতে পারছে না। ও যেন এসে জ্বেলে দেয়। লোকটা গীর্জার ভেতরে ঢুকলো। হাতের কুঠারটা মেঝের ওপর রেখে, চকমকি পাথরে ইস্পাতের টুকরো ঠুকতে লাগল। ফ্রান্সিস অভিজ্ঞতা থেকে জানতো, এখানকার ঠাণ্ডায় মশাল জ্বলতে সময় লাগে। লোকটা চকমকি ঠুকে চলল। আস্তে-আস্তে গীর্জার বাইরে চলে এলো। ঘুমন্ত লোকটাকে ঠেললো কয়েকবার। ঠেলতেই লোকটা উঠে দাঁড়াল। চোখ কচলে দেখে সামনে ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস ইঙ্গিতে ওকে বোঝাল যে, গীর্জার ভেতরে তোমার বন্ধু তোমাকে 'ডাকছে। লোকটা ঘুমচোখে ব্যাপারটা তলিয়ে দেখল না। ও তাড়াতাড়ি গীর্জার মধ্যে ঢুকে পড়লো। ফ্রান্সিস এই সুযোগের প্রতীক্ষাতেই ছিল, ও সঙ্গে-সঙ্গে হ্যাঁচকা টানে দরজাটা বন্ধ করল। তারপর চাবি বের করে তালা লাগিয়ে দিল। আর এক মুহূর্ত দেরী নয়, সে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে এলো। তারপর বরফের ওপর দিয়ে ছুটে চললো সাক্কারটপ পাহাড়টার দিকে। উপায় নেই, ওই পাহাড়াটা ডিঙোতে হবে। পাহাড়ের ধার দিয়ে যেতে গেলে, ওরা শ্লেজগাড়ি চালিয়ে ওকে সহজেই ধরে ফেলবে। কিন্তু গাড়ি তো আর পাহাড়ে উঠতে পারবে না।

বরফের ওপর দিয়ে ছুটতে-ছুটতে পাহাড়ের নীচে পেঁাছে ফ্রান্সিস হাঁপাতে লাগল। এতটা পথ একছুটে চলে এসেছে, এতক্ষণ মেঘ-কুয়াশায় অন্ধকার ছিল চারিদিক। এবার মেঘ-কুয়াশা কেটে গেল। আকাশে দেখা গেল, পূর্ণিমার চাঁদ। বেশ কিছুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল। ইউনিপেড্‌রা যখন এখনও শ্লেজগাড়ি নিয়ে তাড়া করে নি, তার মানে ঐ পাহারাদার দু'টো গীর্জা থেকে বেরোতে পারে নি। গীর্জাটা লোকালয় থেকে একটু দূরেই। ওরা দরজা ধাক্কা

দিলেও কারো কানে সে শব্দ পৌঁছবে না। তাছাড়া ইউনিপেড্‌রা অনেকেই আগুন জেলে মাংস ঝলসাচ্ছে, আর আগুনের চারপাশে বসে ড্রাম পেটাচ্ছে আর গাইছে, হৈ-হল্লা করছে। কাজেই দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ কানেই যাবে না।

বরফের চাঁইয়ের ওপর সাবধানে পা ফেলে-ফেলে ফ্রান্সিস পাহাড়টায় উঠতে লাগল। দম নেবার জন্যে মাঝে-মাঝে থামছে, আবার উঠছে। এত উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তার মধ্যেও পাহাড়ের গায়ে চাঁদের মৃদু আলো পড়ে, যে অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে, তা ওর দৃষ্টি এড়ালো না। সত্যিই, অপূর্ব দৃশ্য। সারা পাহাড়টা থেকে একটা নরম আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নেসার্ক যে কেন এই সৌন্দর্যকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেছে, এবার তার কারণ খুঁজে পেল ও।

একসময় চূড়োয় পৌঁছল ফ্রান্সিস। চাঁদটা তখন কিছুটা পূর্বদিকে ঢলে পড়েছে। ঘুরে দাঁড়াতে চূড়োর ওপাশে ওর দৃষ্টি পড়ল। ও চমকে উঠলো একটা দৃশ্য দেখে। চূড়োর ওপাশেই পাহাড়ের বুকে একটা বিরাট জলাশয়, আশ্চর্য খেয়াল! সেই টলটলে জলের ওপর কোথাও-কোথাও স্বচ্ছ কাঁচের মত বরফের পাতলা আস্তরণ। সেই জলাশয়ে চাঁদের আলো পড়ে এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। সে কিছুক্ষণ নির্বাক সে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলো। তারপর জলাশয়ের ধার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে পাহাড়ের পেছন দিকে এলো। উঁচু-নীচু বরফের চাঁইয়ের ওপর পা রেখে-রেখে ও নীচে নেমে এলো। অস্পষ্ট দেখতে পেল নেসার্কের চামড়ার তাঁবু।

ও যখন তাঁবুর সামনে পৌঁছল, তখন একেবারে দম শেষ। একটু দাঁড়িয়ে থেকে দম নিল। তারপর তাঁবুর চামড়া একটু সরিয়ে ডাকল, 'নেসার্ক—নেসার্ক।'

ও জানতো, নেসার্ক রাজার সঙ্গে কোটল্ডে চলে গেছে। থাকলে এখানে তার বাবা-মা আছে। বারকয়েক ডাকার পর কার নড়া-চড়ার শব্দ পেল। ও এবার একটু গলা চড়িয়ে ডাকল, 'নেসার্কের মা আছেন? নেসার্কের মা?'

এস্কিমোদের ভাষায় কে বলে উঠলো, 'কে?'

ফ্রান্সিস বুঝলো, এটা নেসার্কের মা'র গলা, ও খুশী হলো। অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'আমি ফ্রান্সিস, নেসার্কের বন্ধু'।

এবার চকমকি ঠোকার শব্দ শুনল ও। প্রদীপ জ্বালল, দেখল নেসার্কের মা বিছানা থেকে উঠে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ আলোতে বুড়ী ফ্রান্সিসকে চিনে হাসল, মুখে বলিরেখাগুলো স্পষ্ট হলো। ফ্রান্সিস এস্কিমোদের ভাঙা-ভাঙা ভাষায় বললো, 'আমি পালিয়েছি, এখানে থাকব—শ্লেজগাড়ি চাই'।

নেসার্কের মা মাথা নাড়ল, অর্থাৎ শ্লেজগাড়ি নেই। ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। শ্লেজগাড়ি না পেলে কোর্টল্ড পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। অগত্যা একটা শ্লেজগাড়ি বাটাহালিড্‌ থেকে চুরি করতে হবে। ফ্রান্সিস এবার অন্য বিছানাটার দিকে তাকাল। কিন্তু নেসার্কের বাবাকে দেখতে পেল না। জিজ্ঞেস করলো, 'নেসার্কের বাবা কোথায়?'

বুড়ী কথাটা শুনে দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো। বুঝলো, নেসার্কের বাবা মারা গেছে। ফ্রান্সিস বললো, 'কবে উনি মারা গেলেন?'

বুড়ী বললো 'ইউনিপেড্‌রা ওকে মেরে ফেলেছে।'

বলে হাত দিয়ে কুঠার চালাবার ভঙ্গী করল, অর্থাৎ কুঠার দিয়ে মেরেছে। বুড়ী নিজে বোধহয় কোনরকমে পালিয়ে বেঁচেছে।

ফ্রান্সিস নেসার্কের বাবার বিছানায় বসে, হাতের ভঙ্গী করে বললো, 'এখন ঘুমোব।'

বুড়ী মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিল। সে শুয়ে পড়লো। অনেক চিন্তা মাথায় ভীড় করে এলো। শরীর প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লো। আর চিন্তা না করে ও ঘুমোবার চেষ্টায় পাশ ফিরে শুলো।

* * *

পরের সারাটা দিন ও টুপিকেই রইল। একবারও বেরুলো না। ইউনিপেডরা নিশ্চয়ই ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দুপুরে নেসার্কের বুড়ী মা ওকে খুব যত্ন করে খেতে দিল। এত সুস্বাদু রান্না অনেকদিন খায় নি ও। পাছে বুড়ীর কম পড়ে যায়, এইজন্যে সে একটু কম করেই খেলো।

টুপিকের ফাঁক দিয়ে ফ্রান্সিস সারাক্ষণ বাইরে দিকে নজর রাখলো। বিকেলের দিকে দেখলো দূরে একটা শ্লেজগাড়ি পাহাড়ের পাশ দিয়ে বাঁক নিচ্ছে। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি গুঁড়ি মেরে টুপিক থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর বরফের কয়েকটা চাঁইয়ে আড়ালে পাহাড়টার নীচে এলো। একটা বিরাট বরফের মধ্যে আত্মগোপন করলো। একটু পরেই একটা শ্লেজগাড়ি টুপিকের সামনে এসে দাঁড়ালো। ফ্রান্সিস আড়াল থেকে দেখলো, সেই শক্তিশালী চেহারার লোকটা টুপিকের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে এস্কিমোদের ভাঙা-ভাঙা ভাষায় বছছে, 'ভেতরে কে আছিস্‌— বেরিয়ে আয়।' বুড়ী বেরিয়ে এলো। লোকটা তেমনি চীৎকার ক'রে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে ইউরোপীয়ান একজন এসেছিলো?'

বুড়ী জোরে-জোরে মাথা নাড়তে নাড়ল।

লোকটা বিশ্বাস করলো না। টুপিকের ভেতরে ঢুকলো। একটু পরে বেরিয়ে এলো। গাড়িতে উঠতে-উঠতে বললো, 'কাউকে দেখলে খবর দিবি'।

বুড়ী মাথা নেড়ে বললো, 'আচ্ছা।'

বরফের ওপর ছড়্‌-ছড়্‌ শব্দ তুলে শ্লেজগাড়িটা চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কুকুরগুলোর ডাক শোনা গেলো। তারপর গাড়িটা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলো। ফ্রান্সিস বরফের ফাটলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। বুঝলো, এখানে থাকা নিরাপদ নয়। ইউনিপেড্‌রা ওকে নিশ্চয়ই হন্যে হ'য়ে খুঁজছে। কোর্টল্যেডের দিকে পালাতে হ'বে। কিন্তু তার জন্যে একটা শ্লেজগাড়ি চাই।

ও সন্ধ্যে থেকে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলো। ঘুম থেকে উঠে খেয়ে নিলো। তারপর বুড়ী আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। রাত একটু গভীর হ'তেই ফ্রান্সিস তরোয়ালটা কোমরে ঝুলিয়ে, চামড়া আর পশুর লোমে তৈরী চাদরটা গলায় জড়িয়ে নিলো। তারপর টুপিক থেকে বেরিয়ে এলো। বুড়ীকে ডাকলো না।

বাইরে কালকে রাতের মতোই জোৎস্না পড়েছে। অপরূপ দেখাচ্ছে বরফের পাহাড়টা, যেন চাঁদের নরম আলো গায়ে মেখে শূন্যে ভাসছে ওটা।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে ফ্রান্সিস বেশ কিছুক্ষণ পর বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে গীর্জাটার কাছে এলো। গীর্জা, পাথরের বাড়িগুলোর আড়ালে-আড়ালে গুঁড়ি মেরে রাস্তার ধারে চলে এলো। অনেকক্ষণ থেকেই ইউনিপেড্‌দের ড্রাম বাজানো, হৈ-হল্লা শুনতে পাচ্ছিল। একবার দেখলো, পাশে একটা বড় অগ্নি-কুণ্ড জ্বলছে। অনেক ইউনিপেড্ আগুনটার চারপাশে গোল হ'য়ে ঘিরে বসেছে। ড্রামের বাদ্যি চলছে, গানও গাইছে অনেকে। আর আগুনে মাংস ঝলসানো চলছে।

ফ্রান্সিস চারিদিক তাকাতে লাগলো, যদি কোন শ্লেজগাড়ি পাওয়া যায়। দেখলো, শ্লেজগাড়ি কয়েকটাই আছে। কিন্তু কুকুর আর বল্‌গা হরিণগুলো খুঁটিতে বাঁধা। হরিণ বা কুকুরগুলো নিয়ে গিয়ে গাড়িতে জোড়া, বেশ ঝুঁকির ব্যাপার। ও যখন ভাবছে শেষ পর্যন্ত এই ঝুঁকি নিতেই হবে, তখনই দেখলো, একটা শ্লেজগাড়ি রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল। দু'টো লোক নামলো গাড়িটা থেকে। ম্লান চাঁদের আলোয় ও একটা লোককে চিনলো, সেই শক্তিশালী চেহারার লোকটা। সঙ্গীটিকে নিয়ে লোকটা আগুনের কুণ্ডের দিকে যেতে লাগলো। ফ্রান্সিস আনন্দে লাফিয়ে উঠলো, একেবারে তৈরী শ্লেজগাড়ি পাওয়া গেছে। লোকটা বোধহয় এই গাড়ি চড়ে তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ফ্রান্সিস পাথরের বাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর বরফের ওপর গুঁড়ি মেরে-মেরে শ্লেজগাড়িটার কাছে এলো। ইউনিপেডরা তখন ড্রাম পেটাচ্ছে, হৈ-হল্লা করছে। সে আস্তে-আস্তে গাড়িটাতে উঠে বসল। ধীরগতিতে গাড়িটা পাথরের বাড়ির আড়ালে-আড়ালে চালিয়ে নিয়ে কিছুটা দূরে এলো। এমন সময় ঐ অগ্নিকুণ্ডের দিক থেকে, কে যেন চীৎকার করে বললো। ও দেখলো, কয়েকজন ইউনিপেড্ কুঠার হাতে ছুটে আসছে। ও এবার কুকুরগুলোর গায়ে জোরে চাবুক হাঁকালো। কুকুরগুলো জোরে ছুটতে লাগল। গাড়ি ছুটল দ্রুতগতিতে। একটু পরেই গাড়িটা বরফের প্রান্তরে এসে পেঁছিল। ও পেছনে তাকিয়ে দেখলো, কয়েকজন ইউনিপেড্ তখনও কুঠার হাতে ছুটে আসছে। লম্বা হাঁকিয়ে দ্রুত গাড়ি চালাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে পিছনে তাকিয়ে দেখলো, বিস্তৃত তুষার প্রান্তরে লোকজন বা গাড়ির কোন চিহ্ন নেই।

গাড়ি চললো, ফ্রান্সিস আর গাড়ি থামাল না। বাকী রাতটুকু সমান গতিতে চালাতে লাগলো। বলা যায় না, বল্‌গা হরিণ-টানা শ্লেজগাড়ি নিয়ে যদি ইউনিপেড্‌রা পিছু-ধাওয়া করে, তাহ'লে ওর গাড়ি ধরে ফেলা অসম্ভব কিছু নয়। কাজেই ও ব্যবধান বাড়াতে লাগল, হাতে ইউনিপেড্‌রা ওর নাগাল না পায়।

পরের দিন অনেক বেলা পর্যন্ত গাড়ি চালালো। কিন্তু গাড়ির গতি কমে এলো। কুকুরগুলো অনেকক্ষণ ছুটে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে নিজেও যথেষ্ট ক্লান্তিবোধ করছিল, তাই গাড়ি থামালো। কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিতে, তারা বসে জিভ বার করে হাঁপাতে লাগল। সে এবার গাড়িটায় কী-কী আছে পরীক্ষা করে দেখলো, সিন্ধুঘোটকের শুকনো মাংস, সীলমাছের টুকরো যত্ন করে রাখা। ঠ্যাং-চর্বি-নাড়িভুঁড়ি এসব কুকুরের খাদ্যও আছে। শুকনো কাঠের

টুকরো পেল কিছু, কিন্তু তাঁবু নেই। সেই খোলা প্রান্তরে ও চকমকি ঠুকে আগুন জেলে মাংস রাঁধলো। নিজেও খেলো, কুকুরগুলোকেও খেতে দিল। তারপর আবার সব গুটিয়ে নিয়ে দক্ষিণমুখো গাড়ি চালালো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোর্টল্ড পেঁছিতে হবে।

সন্ধ্যে হলো, তবু ফ্রান্সিস গাড়ি থামালো না। একটু রাত হতে গাড়ি থামিয়ে আবার আগুন জেলে রান্না করল। নিজে খেলো, কুকুরগুলোকেও খেতে দিল। তারপর উন্মুক্ত বরফের প্রান্তরে বলগা হরিণের চামড়া পেতে শুয়ে পড়লো। পায়ের কাছে আগুন জ্বালিয়ে রাখল। ওর ভাগ্য ভাল, তুষার বৃষ্টি হলো না, শান্তিতেই কাটল রাতটা।

পরদিন আবার যাত্রা। এই পথে অনেক চাঁই-ভাঙা বরফ ভেঙে গাড়ি চালাতে হলো। খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে গিয়ে গাড়ির গতি গেল কমে। এবড়ো-খেবড়ো সেই বরফের প্রান্তর পেরোতে দুপুর গড়িয়ে গেল। দুপুরে বিশ্রাম করে খাওয়া-দাওয়া সেরে, সে আবার গাড়ি চালাতে লাগল।

সন্ধ্যের আবছা অন্ধকারে কোর্টল্ডের পাথরের বাড়িঘর নজরে পড়ল। নির্বিঘ্নে পথটা পার হতে পেরেছে বলে, সে মনে-মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো।

রাজা সোক্কাসনের বাসস্থান খুঁজে পেতে বেশী দেরী হলো না। একটা পাথরের বাড়িতে পুত্র ও রানীকে নিয়ে রাজা আশ্রয় নিয়েছেন। বাড়িটার চারদিকে পাহারা দিচ্ছে একদল সৈন্য। ফ্রান্সিসকে দেখে ওরা চিনতে পেরে পথ ছেড়ে দিল।

একটা ঘরে বলগা হরিণের চামড়ার বিছানায় রাজা সোক্কাসন বসেছিলেন। একটা মৃদু আলো জ্বলছিল ঘরে। ফ্রান্সিস রাজাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। রাজা কেমন যেন শূন্যদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন। রাজার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চোখ-মুখ দেখে সে মনে ব্যথা পেল। আস্তে-আস্তে বাত্তাহালিডে কী ঘটেছে, কী করে ও পালালো এইসব কথাই বলে গেল। রাজা শুনে গেলেন। তারপর বিষাদগ্রস্ত স্বরে বললেন, 'ফ্রান্সিস, আমি রাজ্যোদ্ধারের কোন আশাই দেখছি না। বাকী জীবনটা আমাকে এখানেই নির্বাসনে কাটাতে হবে।'

ফ্রান্সিস বললো, 'উদ্যম হারাবেন না মহারাজ। আমি একটা পরিকল্পনা ছকে নিয়েছি। যদি সফল হই, তাহ'লে আপনি আবার রাজ্য ফিরে পাবেন'।

রাজা কিছুক্ষণ ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দেখুন চেষ্টা করে।'

—'আচ্ছা নেসার্ক কোথায় ?' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—'ও আঙ্গামাগাসালিকে গেছে, খাবার-দাবার জিনিসপত্র আনতে।'

—'কবে ফিরবে ?'

—'আজকেই ফেরার কথা।'

—'তাহ'লে আমি কিছুক্ষণ পরে আসবো।'

ফ্রান্সিস ঘরের বাইরে এলো। ও নুয়ালিকের খোঁজে বেরলো। খুঁজতে-খুঁজতে ও স্থানীয় এস্কিমো-সর্দারের তাঁবুতে এলো। নুয়ালিক তাঁবুতেই ছিল, তাকে দেখে হাসল। ফ্রান্সিস বললো, 'নুয়ালিক, একটা থাকবার আস্তানা দাও।'

নুয়ালিক সব কথা বুঝল না, শুধু হাসতে লাগলো। ফ্রান্সিস তখন অংগ-ভংগী করে বোঝালো, ও শুয়ে থাকবার জায়গা চায়। নুয়ালিক মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝালো, তার একটা আস্তানা ও করে দেবে। সেটা করে দিলও। বড় তাঁবুটার কোণার দিক থেকে একটা ছোট ছেঁড়া তাঁবু বের করল। বাইরে একটা কাঠ-পুঁতে তাঁবুটা পাতলো। কিন্তু ছেঁড়া জায়গাগুলো দেখে ফ্রান্সিস হতাশ হলো। এই ছেঁড়া তাঁবুতে কি থাকা যাবে? নুয়ালিক ওর মনের ভাব বুঝতে পারল। একটু হেসে ও নিজের তাঁবু থেকে ছুঁচ আর চামড়া-পাকানো সুতো নিয়ে এলো। এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁবুটা সেলাই করে একেবারে নতুনের মতো করে দিল। তাঁবুর ভেতরে একটা কাঠের পাটাতনমতো পেতে দিল। তার ওপর সিন্ধুঘোটকের চামড়া পেতে দিল। ফ্রান্সিস চুরি-করা শ্লেজগাড়িতে কিছু বিছানার সরঞ্জাম পেল। সে-সব পেতে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সুন্দর বিছানামত হয়ে গেল। একটা সীলমাছের তেলের প্রদীপও জেবলে দিয়ে গেল।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ এই নতুন আস্তানাটায় রইলো। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে পরবর্তী যে কাজগুলো করতে হবে, সে-সব ভাবল। সবার আগে নেসার্ককে চাই। একমাত্র সেই হ্যারির খোঁজ আনতে পারবে। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে সে উঠে পড়লো। চললো, যে বাড়িতে রাজা আছেন সেইদিকে। বাড়িটার কাছা-কাছি পেঁছিল যখন, তখন রাত হয়েছে। বাইরে একজন এস্কিমো সৈন্য ভাবভঙ্গীতে জানালো, রাজা শুয়ে পড়েছেন। এখন দেখা হবে না। ফ্রান্সিস ওকে বারবার বলতে লাগলো, 'নেসার্ক ফিরেছে কিনা, সেই খবরটা আমার চাই।'

সৈন্যটা কিছুই বুঝতে পারল না। তখন সে বারবার 'নেসার্কে'র নাম করতে লাগল সৈন্যটা তখন আঙ্গুল দিয়ে একটা তাঁবু দেখালো। তাহলে নেসার্ক ঐ তাঁবুটাতেই আছে।

ফ্রান্সিস তাঁবুটার কাছে গিয়ে নেসার্কের নাম ধরে ডাকতেই, সে বেরিয়ে এলো। ও তো ফ্রান্সিসকে দেখে অবাক, ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। দু'জনে তাঁবুটাতে ঢুকল। আরো দু;জন এস্কিমো সৈন্য ভেতরে শুয়ে আছে। নেসার্ক বাত্তাহালিডের খবর জিজ্ঞেস করলো। সে সব ঘটনা বলে গেল, হ্যারির বন্দীদশার কথাও বললো। এবার নেসার্ক জিজ্ঞেস করলো, 'আমার বাবা-মার সংবাদ কিছু জানেন?'

—'তোমাদের তাঁবুতেই আমি প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিলাম।'

—'বাবা-মা ভালো আছে তো'?

—'এ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ।' ফ্রান্সিস আমতা-আমতা করে বললো।

নেসার্কের মনে একটু সন্দেহ দেখা দিল। বললো, 'সত্যি করে বলুন।'

ফ্রান্সিস একটু ভাবল, এখন সামনে অনেক কাজ। নের্সাক যদি বাবার মৃত্যু-সংবাদে ভেঙে পড়ে, তাহ'লে সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে।

হ্যারি এখনও বন্দী, যা করবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে হবে। তবু বাবার মৃত্যু-সংবাদ ছেলের কাছে গোপন রাখা উচিত হবে না। সে নেসার্কের কাঁধে হাত রাখলো। তারপর বলতে লাগলো, 'নেসার্ক আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ। আমার বন্ধুকে বাঁচাতে হবে। বাত্তাহালিড ইউনিপেডদের হাত থেকে উদ্ধার

করতে হবে। এখন তোমার সাহায্য না পেলে আমি কিছুই করতে পারবো না।'

—'আপনি সত্যি কথাটাই বলুন। যত দুঃখের হোক, আমি সহ্য করবো।'

—'তোমার বাবাকে ইউনিপেড্‌রা মেরে ফেলেছে।'

নেসার্ক শুধু একবার তার মুখের দিকে তাকালো। তারপর মাথা নীচু করে বসে রইলো। একটু পরেই ওর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো। ফ্রান্সিস বুঝলো, ও নিঃশব্দে কাঁদছে। সে ওর দু'কাঁধে হাত রেখে ডাকল, 'নেসার্ক', ভাই কেঁদো না, বরং প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবো'।

নেসার্ক ক্ষাণিকক্ষণ চুপ করে থেকে চোখ মুছলো। তারপর সহজ গলায় বললো, 'আমি এর প্রতিশোধ নেবো।'

ফ্রান্সিস উৎসাহের সঙ্গে বললো, 'আমিও তাই বলি। ভেঙে-পড়লে চলবে না। মনকে শক্ত করে কর্তব্যগুলো করে যেতে হবে। এখন এ ছাড়া উপায় নেই।'

—'আপনি কী ভেবেছেন বলুন'। নেসার্ক সহজ গলায় বললো।

—'আমার মূল পরিকল্পনা কার্যকর করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন, হ্যারিকে, মানে আমার বন্ধুকে মুক্ত করে আনা। এটা আমরা পারবো না। কারণ আমাদের ওরা সহজেই চিনে ফেলবে।'

—'আমি চেষ্টা করবো।' নেসার্ক বললো, 'আপনি জানেন না, আমি অনেক-দিন ইউনিপেড্‌দের হাতে বন্দী ছিলাম। ওদের ভাষা, জীবনযাত্রার পদ্ধতি সবই আমি জানি।'

—'তাহ'লে একমাত্র তুমিই পারবে।'

—'বেশ, এখন আপনি কী করবেন?'

—'কাল সকালেই আমি রাজা সোক্কাসনের কাছে একটা বল্‌গা হরিণ-টানা শ্লেজগাড়ি চাইব। গাড়ি নিয়ে আমি আঙ্গা-মাগাসালিকে যাবো। আমার বন্ধুদের নিয়ে এখানে আসব। তার পরের পরিকল্পনাটা এখানে এসে তৈরী করবো। তুমি ততোদিন কোথাও যাবে না, এখানেই থাকবে। ইউনিপেডদের রাজা এভাল্ডাসন যে কোন মুহূর্তে আমার বন্ধুকে মেরে ফেলতে পারে।'

—'ঠিক আছে, আপনি আপনার বন্ধুদের নিয়ে আসুন। আমি এখানেই আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

ফ্রান্সিস ওর হাত জড়িয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিল। তারপর তাঁবুর বাইরে চলে এলো। নিজের তাঁবুতে ফেরার সময় দেখলো, দিগন্তবিস্তৃত বরফের প্রান্তরে মৃদু জ্যোৎস্না পড়েছে। ও হিসেব করে দেখলো, এখন শুক্লাপক্ষ চলছে। তার মানে আরও বেশ কদিন রাত্রে চাঁদের আলো পাওয়া যাবে। এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না।

তাঁবুতে ফিরে দেখলো, নুয়ালিক ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। নুয়ালিক ওকে দেখে হাসল, তারপর খেতে বললো। খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শুলো ও, অনেকক্ষণ ঘুম এলো না। নানা কথা ভাবতে-ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

* * *

পরদিন সকালেই নেসার্ককে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস রাজার সঙ্গে দেখা করলো।

সে মোটামুটি তার পরিকল্পনা বললো। রাজা যেন কিছুটা আশস্ত হলেন। বললেন, 'তুমি পারবে ইউনিপেড্‌দের তাড়াতে ?'

—'চেষ্টার ত্রুটি করবো না। এখন আমার একটা দ্রুতগামী গাড়ি চাই।'

—'তুমি আমার গাড়িটাই নাও। আমি তো আর এখন কোথাও বেরোচ্ছি না।' সেইমত নির্দেশ দিলেন।

বাইরে এসে ফ্রান্সিস নেসার্ককে বললো, 'তুমি গাড়িটা নিয়ে আমার তাঁবুর কাছে এসো। প্রয়োজনীয় সব জিনিস গাড়িটাতে দিও। আমিও আমার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিয়ে তৈরী থাকবো।'

তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে ফ্রান্সিস তৈরী হয়ে নিল। একটু পরেই নেসার্ক রাজার বল্‌গা হরিণে-টানা গাড়িটা নিয়ে হাজির হলো। সব দেখে-শুনে সে দক্ষিণমুখো গাড়ি চালাতে লাগলো।

বল্‌গা হরিণে টানা গাড়ি। তুষারের প্রান্তর দিয়ে অত্যন্ত বেগে ছুটে চললো। ও স্থির করল, সন্ধ্যের আগে আর গাড়ি থামাবে না। কিন্তু বিকেলের দিকে কুয়াশার গাঢ় আস্তরণ সামনে সব কিছু ঢেকে দিল। একটু পরেই প্রায় মাথার কাছে নেমে আসা মেঘ থেকে তুষার বৃষ্টি শুরু হলো। ও বহুকষ্টে দিক ঠিক রাখল, গাড়ির গতি কমে এলো। মেঘ-কুয়াশা, তুষারবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ওর গাড়ি ধীরে-ধীরে চললো। ওর সমস্ত পোষাক তুষারে ঢেকে গেল।

ওর ভাগ্য ভালো বলতে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রচণ্ড হাওয়ার ঝাপ্‌টা শুরু হলো। মেঘ-কুয়াশা উড়ে গেল, হাওয়ার বেগের প্রচণ্ডতাও কমলো। সন্ধ্যের মুখে আকাশে মেরু-নক্ষত্র দেখা দিল। একটু পরে অস্পষ্ট চাঁদের আলোও দেখা গেল। ফ্রান্সিস বুঝল, হরিণগুলোর বিশ্রাম দরকার। নিজেও ক্লান্ত, এবার বিশ্রাম চাই। দুটো চাঁইয়ের কাছে এসে ও গাড়ি থামালো। দু'টো চাঁইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় তাঁবু খাটালো। চকমকি ঠুকে আগুন জেলে, শুকনো মাংস রাঁধলো। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লো। নানা চিন্তা মাথায় ভীড় করে এলেও, ওরই মধ্যে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন আবার পথ চললো। গাড়ির গতি যথেষ্ট বাড়িয়ে দিল। একেবারে সন্ধ্যে পর্যন্ত নাগাড়ে গাড়ি চালালো। দুপুরে বিশ্রামও নিল না, কিছু খেলোও না। সন্ধ্যেয় গাড়ি থামলো, রাত্রির মতো বিশ্রাম।

তিনদিনের দিন ও আঙ্গা-মাগাসালিক বন্দরে পৌঁছল। দূর থেকে সাঙখুই ওকে প্রথম দেখলো, তখন দুপুর। সাঙখু ছুটতে-ছুটতে কাছে এলো। গাড়ি থামিয়ে সাঙখুকে তুলে নিল। যেতে-যেতে বললো, 'কেমন আছো সাঙখু ?'

সাঙখু হেসে মাথা ঝাঁকালো।

সমুদ্রের ধারে এসে থামল। দেখলো, ওদের জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে ও বন্ধুদের ডাকতে লাগলো। জাহাজের ডেকেই দাঁড়িয়ে ছিল বিস্কো। ফ্রান্সিসকে দেখে ওর মুখ খুশীতে ভরে উঠলো। ও ছুটোছুটি করে সবাই ডাকতে লাগলো। সবাই এসে ডেকে জড়ো হলো। কিন্তু ওরা বেশ অবাক হলো ফ্রান্সিসের সঙ্গে হ্যারিকে না দেখে। ওরা তাড়াতাড়ি জাহাজ থেকে দড়ির সিঁড়ি

ফেলে দিল। ফ্রান্সিস আর সাঙখু সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে জাহাজে উঠে এলো। সব সব বন্ধুরা ফ্রান্সিসকে ঘিরে ধরল। হ্যারির কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো।

ফ্রান্সিস সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বলে গেল। তারপর সবাইকে সম্বোধন করে বললো, 'ভাইসব, অনেক বিশ্রাম করেছ। আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না। সাঙখুর সঙ্গে কয়েকজন চলে যাও। অন্ততঃ চারটে শ্লেজগাড়ি আর কুকুর জোগাড় করে আনো। আমরা এক্ষুনি কোর্টল্ড রওনা হবো।'

বিস্কো বললো, 'ফ্রান্সিস, আমাদের আধঘণ্টা সময় দাও। আমরা খেয়ে-দেয়ে তৈরী হয়ে নিচ্ছি। তোমারও নিশ্চই খাওয়া হয় নি ?'

—'বেশ আমিও খেয়ে-দেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারতে হবে।'

সাঙখু শ্লেজগাড়ি যোগাড় করতে চলে গেল। একটু পরেই এস্কিমো-সর্দার কালুটুলা এলো। বোধহয় সাঙখুর কাছে খবর পেয়েছে। ও মুখ গম্ভীর করে ফ্রান্সিসের কাছে সব শুনলো। তারপর ভাঙা-ভাঙা নরওয়ের ভাষায় বললো, 'ইউনিপেড্‌রা বর্বর অসভ্য। ওদের বিশ্বাস করো না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধুকে বাঁচাও।'

কালটুলা আর কোন কথা না বলে জাহাজ ছেড়ে চলে গেল।

সমুদ্রের ধারেই সব শ্লেজগাড়ি তৈরী হয়ে নিল। ফ্রান্সিস সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস গাড়িতে তুলে নিতে বললো। গোটাদশেক কুঠারও নিতে বলে দিলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই তৈরী হয়ে গাড়িতে এসে বসল। ফ্রান্সিসও তার গাড়িতে উঠলো। এমন সময় কুঠার হাতে সাঙখু এসে হাজির বললো, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।'

অগত্যা ওকেও গাড়িতে তুলে নেওয়া হলো। রওনা হবার আগে ফ্রান্সিস গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বললো, 'চাবুক চালাবার সময় সাবধান, যেন চাবুকটা লম্বা লাগামে আটকে না যায়। কারো অসুবিধে হলে সাঙখুকে ডেকো, ও সব বুঝিয়ে দেবে।'

ফ্রান্সিস গাড়িতে বসে ওর গাড়ি ছেড়ে দিলে। দেখা গেল, সবাই ওর পেছনে -পেছনে গাড়ি চালাতে শুরু করলো।

যাত্রা শুরু হলো, গাড়ির মিছিল চললো। গাড়ি চলাকালে বরফ ভাঙার খস্‌খস্‌ শব্দ, ওদের কথাবার্তা, ডাকাডাকির শব্দে নির্জন বরফের প্রান্তর মুখর হয়ে উঠলো। কিছ দূর যেতেই দুটো গাড়ি আটকে গেল। সেই চাবুক লাগামে আটকে যাওয়ার ব্যাপার। সাঙখু উঠে এসে চাবুক খুলে আবার গাড়ি চালু করল। আবার সব গাড়ির একসঙ্গে চলা শুরু হলো।

ফ্রান্সিস যতটা তাড়াতাড়ি কোর্টল্ডে পৌঁছবে ভেবেছিল, তা আর হলো না। প্রায় পাঁচদিন লেগে গেল। এখানে পৌঁছে তারা আগের তাঁবুটাতে আস্তানা নিল। পথে তুষার-ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হলো না বলে ওরা খুশী হলো।

সন্ধ্যেবেলা ফ্রান্সিস সবাইকে নিজের তাঁবুতে ডাকলো। সবাই এলে সে বললো, 'ভাইসব, আমাদের আর দেরী করা চলবে না। আমি নেসার্ককে নিয়ে কাল সকালেই বাট্টাহালিডে রওনা হবো। তোমরা দুপুর নাগাদ রওনা দেবে। সাঙখু

তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তোমরা কুকুরটানা গাড়িতে যাবে, কাজেই তোমাদের ওখানে পেঁছিতে দেরী হবে। তোমরা পেঁছিবার আগেই আমরা হ্যারিকে মুক্ত করবো। তার পরের কাজ ওখানে তোমরা পেঁছাবার পর ঠিক করবে।'

সভা ভেঙে গেল। কথা বলতে-বলতে ওর বন্ধুরা নিজেদের তাঁবুতে চলে গেল। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে সে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভাবতে লাগলো।

ভোর হতেই নেসার্ক ওর কাছে এলো। রাজা সোক্কাসনের বল্গা হরিণ-টানা শ্লেজগাড়িটা ওর তাঁবুর বাইরে রাখা ছিল। খুব তাড়াতাড়ি সব গোছ-গাছ করে নিয়ে ও আর নেসার্ক গাড়িতে উঠে বসল। বন্ধুরা কয়েকজন এসে বিদায় জানালো। ও গাড়ি ছেড়ে দিতে বললো। নেসার্ক গাড়ি চালাতে লাগলো। ও গাড়ি চালাতে ওস্তাদ। নিপুণ হাতে বেশ দ্রুতগতিতে ও গাড়ি চালাতে লাগলো।

গাড়ি চললো বরফের প্রান্তরের ওপর দিয়ে। আকাশ অনেকটা পরিষ্কার। বেশ দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। দুপুরের একটু আগে ওরা দুটো মেরুভল্লুক দেখলো। কাছাকাছি আসতে দেখলো, একটা মা-ভালুক আর বাচ্চা। নেসার্ক গাড়ি চালাতে-চালাতে বললো, 'বাচ্চাটা ধরবো নাকি ?'

—'না।' ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলতে বললো, 'এখন প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাছে মূল্যবান।'

নেসার্ক আর কোন কথা না বলে গাড়ি চালাতে লাগলো। ভালুক দুটো কিছু দূরে গাড়িটা চললো। নেসার্ক বেশী কাছে গেল না। একে মা-ভালুক তার ওপর সঙ্গে বাচ্চা রয়েছে। হয়তো আক্রমণ করে বসতে পারে।

কিছুদূর এগিয়ে ওরা তাঁবু খাটালো। রান্না-খাওয়া সেরে আবার গাড়ি ছোটালো। পথে ওরা মেরু জ্যোতি দেখলো, কি অপরূপ দৃশ্য। ফ্রান্সিস আগেও দেখেছে, তাই খুব অবাক হলো না। তাছাড়া ওর মনে তখন নানা চিন্তা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার মত মনের অবস্থা নয়।

* * *

দিন চারেকের মধ্যেই ওরা বাত্রাহালিডের কাছাকাছি পেঁছে গেল। তখন সকাল, আকাশে মেঘ-কুয়াশা নেই। অনুজ্জল রোদে ওরা দূর থেকে বাত্রাহালিডের ঘর-বাড়ি, টুপিক দেখতে পেল। ফ্রান্সিস তখন গাড়ি চালাচ্ছিল, ও গাড়ি থামালো। আর এগুনো ঠিক হবে না। ইউনিপেডদের নজরে পড়ে যেতে পারে ওরা। গাড়ি থামিয়ে তাঁবু খাটালো। একটু বিশ্রাম করে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সারল।

তারপর ফ্রান্সিস নেসার্ককে বললো, 'নেসার্ক, তুমি তো আমাদের থাকবার ঘরটা দেখেছ। আমার বন্ধু হ্যারি ঐ ঘরেই আছে। খুব সাবধানে তাকে মুক্ত করতে হবে।'

—'এখন নয়, আমি রাত্রে যাবো।' নেসার্ক বললো।

—'বেশ—' ফ্রান্সিস বললে।

* * *

সন্ধ্যে গেল, রাত হলো। রাত বাড়তে নেসার্ক একটা কুঠার হাতে নিল।

তারপর তাঁবু থেকে বেরলো। ওখানে শ্লেজগাড়ি নিয়ে যাওয়া চলবে না, হেঁটে যেতে হবে। ফ্রান্সিস নেসার্কের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল, নেসার্ক মৃদু হাসল। তারপর বরফের প্রান্তরের ওপর দিয়ে বাট্টাহালিডের দিকে হাঁটতে লাগলো। আকাশে ভাঙা চাঁদ মৃদু জ্যোৎস্না পড়েছে বরফের ওপর। নেসার্ক হেঁটে চললো।

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ সেই বরফের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তাঁবুতে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুমুতে পারলো না। নানা চিন্তা ভীড় করে এলো। মাঝে-মাঝে তন্দ্রা এলো। পরক্ষণেই তন্দ্রা ভেঙে উঠে বসতে লাগলো। নেসার্ক কখন ফেরে এই চিন্তা। হ্যারি কেমন আছে, কে জানে?

রাত শেষ হয়ে এসেছে তখন। নেসার্কের ডাকে ওর তন্দ্রা ভেঙে গেলো। নেসার্ক বিছানায় বসে হাঁপাতে লাগলো। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। ফ্রান্সিসের মন চিন্তাকুল, উৎকণ্ঠিতও। তবু কোন প্রশ্ন করলো না। একটু পরে নেসার্ক বললো, 'আপনাদের ঐ ঘরে হ্যারি নেই।'

ফ্রান্সিস চমকে উঠে বসলো। 'তবে ও কোথায়?

—'তার হদিশ করতে পারি নি, তবে খবর জোগাড় করেছি যে, কিছু এস্কিমোকে রাজা এভাল্ডাসন রাজবাড়িতে বন্দী করে রেখেছে। কাল রাত্রে সেখানে খোঁজ করবো'।

পরের দিনটা শুয়ে বসে কাটালো। আবার রাত হ'লে নেসার্ক কুঠার হাতে বাট্টাহালিডের দিকে চললো।

সারারাত ফ্রান্সিস দুশ্চিন্তায় ঘুমুতে পারলো না। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। আবার উঠে তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ায়। দেখে নেসার্ক আসছে কিনা। শেষরাতের দিকে নেসার্ক ফিরে এলো। ব'সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলো। তারপর ডাকলো 'ফ্রান্সিস?'

—'বলো। হ্যারিকে পেলে?'

—'একটা দুঃসংবাদ আপনাকে দিতে হচ্ছে।'

—'শীগগির বলো।'

—'হ্যারি—মারা গেছে।'

ফ্রান্সিস দ্রুত বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো। ওর বুক থেকে গম্ভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ও দ্রুত এগিয়ে এসে নেসার্কের দু' কাঁধে হাত রাখলো, 'সব বলো নেসার্ক।

রাজবাড়িতে যারা বন্দী আছে, তাদের মধ্যে হ্যারিকে দেখলাম না। তাহ'লে হ্যারিকে কোথায় রাখা হয়েছে? রাজবাড়ির অন্য ঘরগুলো, টুপিকগুলো, সব জায়গায় খুঁজে-খুঁজে দেখলাম। হতাশ হলাম, কোথাও হ্যারি নেই।' নেসার্ক একটু থামলো। তারপর বলতে লাগলো, 'ওদের নাচ-গানের এক আসরে গিয়ে বসলাম। সেইখানেই ইউনিপেড্‌দের এক সর্দারের সঙ্গে ভাব জমালাম।

—'হ্যাঁ, ঐ লোকটাকে আমি চিনেছি। আমাদের দেখাশুনার ভার ছিল ঐ লোকটার ওপরে। ওর শ্লেজগাড়িটা নিয়েই আমি পালিয়েছিলাম।'

—'তারপর?'

—'কথায়-কথায় ও বললো একদিন রাত্রিরে ওরা নাকি দেখে, হ্যারি ঘরে মরে পড়ে আছে।'

—'তাহলে ওরা হ্যারিকে মারে নি ?'

—'ও তো তাই বলেলো। ওরা আর বৈদ্য-টৈদ্য ডাকে নি, একটা বিদেশীর জন্যে কে আর ঝামেলা অতো পোহায় ? ওরা মৃতদেহটা সাক্কারটপ পাহাড়ের এক গুহায় ফেলে দিয়েছিল'।

ফ্রান্সিস মাথা নীচু ক'রে চুপচাপ ব'সে রইলো ও নিজেকে সংযত করার অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। একসময় দু'হাতে মুখ ঢেকে ও কেঁদে উঠলো। নেসার্ক ওর কাঁদে হাত রাখলো। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ফ্রান্সিসের কান্না বন্ধ হল না। ওর বারবার হ্যারির কথা মনে হ'তে লাগলো। সুখে-দুঃখে হ্যারির সঙ্গে যে দিনগুলো কাটিয়েছে, সেই-সব কথা মনে হ'তে লাগলো। হ্যারির হাসোজ্জ্বল মুখ, ওর কথা বলার ভঙ্গী ও প্রতিজ্ঞাদৃঢ় মুখ, সবই মনে পড়তে লাগলো। ফ্রান্সিস কাঁদতে লাগলো।

সে যখন একটু শান্ত হ'ল, তখন ভোর হ'য়ে গেছে।

একটু বেলায় ফ্রান্সিসের বন্ধুরা এসে পৌঁছল। বিস্কো ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। দেখলো, সে শুয়ে আছে। ওরা এল, অথচ সে একবারও তাঁবুর ভেতর থেকে বেরল না; এটা বিস্কোর কাছে একটু অদ্ভুত লাগলো। ও বুঝলো, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু ঘটছে। ও আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের গায়ে ধাক্কা দিল। বললো, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো ?'

ফ্রান্সিস এতক্ষণ চোখ চাপা দিয়ে শুয়ে ছিল। এবার চোখের ওপর থেকে হাতটা সরালো। বিস্কো দেখলো, ফ্রান্সিসের চোখে জল। বলে উঠলো 'কী হ'য়েছে ফ্রান্সিস ?'

ফ্রান্সিস কোন কথা বলতে পারলো না। বিস্কো বুঝলো, হ্যারি নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে। ও জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যারি কেমন আছে ?'

ফ্রান্সিস ভগ্নস্বরে আস্তে-আস্তে বললো, 'বিস্কো, হ্যারি মারা গেছে।'

বিস্কো চমকে উঠে। বললো,' বলো কী ?'

তখন ফ্রান্সিস আস্তে-আস্তে নেসার্ক যে খবর এনেছে, সব বললো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসের বন্ধুরা খবরটা শুনলো। এতক্ষণ ওরা বেশ খুশীমনে তাঁবু খাটাচ্ছিল। নতুন দেশ, ভালোই লাগছিল ওদের। হ্যারির মৃত্যু-সংবাদ মুহূর্তে ওদের সবাইকে স্তব্ধ ক'রে দিলো। সবাই নিঃশব্দে ফ্রান্সিসের তাঁবুতে এসে ওকে ঘিরে দাঁড়াল।

ফ্রান্সিস উঠে বসল। তারপর ধীরস্বরে বলতে লাগলো, 'ভাইসব, আজকে আমাদের বড় শোকের দিন। আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু হ্যারি মারা গেছে। কিন্তু আমি কোনদিন হার মানি নি, আজকেও মানবো না। হ্যারির মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নেবই। একটু থেমে ও বলতে লাগলো, 'ভাইসব, আমি পরিকল্পনা ছকে রেখেছি। আজ রাত্রেই আমরা বাত্রাহালিডকে ডানদিকে রেখে অনেকটা ঘুরে সাক্কারটপ পাহাড়ে যাবো। সবাই সারাদিন বিশ্রাম করে নাও। সন্ধ্যের পরেই অন্ধকার হ'লে আমরা আবার যাত্রা শুরু করব'।



সবাই আস্তে-আস্তে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে গেল। সন্ধ্যের পর ভাইকিংদের মধ্যে কর্মতৎপরতা শুরু হ'ল। সবাই বরফের প্রান্তরে এসে দাঁড়ালো।

বিস্কো ফ্রান্সিসকে ডাকতে এল। 'ফ্রান্সিস, আমরা তৈরী, চলো।'

ফ্রান্সিস তাঁবুর বাইরে এল। বিস্কো বললো, 'আমরা কি স্লেজগাড়িতে যাবো ?'

—'না।' ফ্রান্সিস বললো, 'গাড়ির কুকুর নিশ্চয়ই চুপ ক'রে থাকবে না, ডাকবে। তাহ'লে আমরা ধরা পড়ে যাবো। আমাদের হেঁটে যেতে হবে। সবাইকে কুঠার নিতে বলো।'

পরপর সবাই দাঁড়াল। একটু রাত হতেই যাত্রা শুরু হল। আকাশে ভাঙা চাঁদ উঠল একটু পরেই। নরম জ্যোৎস্না পড়ল বরফের প্রান্তরে। শুধু জুতোর তলায় বরফ ভাঙার শব্দে আর উত্তরে হাওয়ার শন্-শন্ শব্দ। চারদিকে আর কোন শব্দ নেই।

প্রায় মাঝরাতে ওরা সাক্কারটপ পাহাড়ের তলায় গিয়ে গেঁছিল। তারপর ঘুরে পাহাড়ের পেছনে গেল। সেখান থেকে পাহাড়ে ওঠা শুরু হল। এতদূর হেঁটে এসে তারপর পাহাড়ে ওঠা। সকলেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

বিস্কো ফ্রান্সিসকে বললো, 'সবাই খুব ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম নিতে দাও।'

ফ্রান্সিস বিস্কোর দিকে তাকাল। দৃঢ়স্বরে বললো, 'না। আজ রাতের মধ্যেই সব সারতে হবে। পাহাড়ে উঠতে শুরু কর।' এই কথা বলে ফ্রান্সিস সবার আগে পাহাড়ে উঠতে লাগলো।

ফ্রান্সিসের সহ্যশক্তি দেখে সকলেই অবাক হল। তাকে দেখে মনেই হচ্ছিল না, ও এতটা পথ হেঁটে এসেছে। ওর সর্বাঙ্গে যেন প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা। বাকী সকলের আর বসা হল না। ওরা ফ্রান্সিসের পেছনে-পেছনে পাহাড়ে উঠতে লাগলো। কেউ-কেউ চাঁদের মৃদু আলোয় বরফের পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে লাগলো। পাহাড়ের প্রায় চূড়োর কাছাকাছি ওরা পেঁছিল, তখন বিস্ময়ে সব্যই হতবাক হয়ে গেল। সম্মুখে গলাজলের বিরাট সরোবর। তাতে চাঁদের আলো পড়ে এক বিচিত্র রূপময় জগৎ রচনা করেছে। উত্তুরে হাওয়ার মাঝে-মাঝে মৃদু ঢেউ উঠেছে। তখন চাঁদের ছায়া ভেঙে যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস সকলের দিকে ফিরে তাকাল। তারপর বললো, 'ভাইসব বরফ কেটে এই গলা জলের স্রোত আমরা বাট্টাহালিডের দিকে নামিয়ে দেবো। ভাসিয়ে দেব, তছনছ করে দেব সবকিছু। একটু থেমে বললো, 'এবার সবাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে নাও। কারণ এর পরে আর বিশ্রাম করার অবকাশ পাবে না। এই জলধারা নামতে শুরু করলেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আমাদের পাহাড়ের পেছন দিকে নেমে যেতে হবে, নইলে সেই জলধারায় আমরাও ভেসে যাবো।

সবাই বরফের ওপর বসল। তখনও অনেকে হাঁপাচ্ছিল। ওখান থেকে কুয়াশার জন্যে বাট্টাহালিডদের ঘর-বাড়ি, তাঁবু, গীর্জা কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু ইউনিপেডদের ড্রাম বাজনা, হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছিল। বসে রইল অনেকে। কেউ-কেউ বরফের ওপর শুয়ে পড়লো। সকলেই অবাক হয়ে চাঁদ, পাহাড়, সরোবর দেখাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। কুঠারটা হাতে নিয়ে বরফের ওপর কুঠার চালাল, শব্দ উঠল ঠক্। বেশ শক্ত বরফ। ফ্রান্সিসের দেখাদেখি আর সবাই উঠে দাঁড়াল। সবাই মিলে বরফের ওপর কুঠার চালাতে লাগলো। শুধু হাওয়ার শন্-শন্ শব্দ, মানুষের শ্বাসের শব্দ আর বরফে কুঠারের আঘাতের শব্দ।

ঠক্-ঠক্—বরফ ভাঙার কাজ চলছে। রাত শেষ হ'য়ে এল প্রায়। চাঁদ দিগন্তের দিকে অনেকটা ঢলে পড়েছে। খাল কাটা শেষ হ'ল। আবার একটু বিশ্রাম ক'রে নিল সবাই। এবার সরোবরের দিক থেকে কয়েকটা বরফের চাঁই ভেঙে ফেলার পরই সরোবরের জল খাল দিয়ে নীচের দিকে ছুটল। ফ্রান্সিস কুঠার শূন্যে ঘুরিয়ে চীৎকার করে বললো, 'আর এক-মুহূর্ত দেরী নয়। সবাই পাহাড়ের পেছন দিয়ে আসতে শুরু কর।'

সবাই ছুটল পাহাড়ের পেছন দিকে। বরফের চাঁইয়ে সাবধানে পা রেখে-রেখে সবাই নামতে লাগলো।

ওদিকে মুক্ত জলস্রোত ছুটলো নীচের দিকে। গলা জল বরফের চাঁইয়ের ফাটলগুলোতে ঢুকতে লাগলো। বরফের চাঁইগুলো আল্‌গা হয়ে যেতে লাগলো। প্রচণ্ড শব্দে চাঁইগুলো ফেটে যেতে লাগলো। বড়-বড় বরফের টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ফ্রান্সিসদের কাটা খাল বড় হতে লাগলো। মুহুর্মুহু বরফের চাই ফাটতে লাগলো। জলপ্রপাতের মত জলধারা প্রচণ্ড বেগে ছুটল বাট্টাহালিডের দিকে। জলধারার প্রথম ধাক্কাতেই টুপিকগুলো খড়কুটোর মত ভেসে গেল। ফ্রান্সিসরা নামতে-নামতে বুঝতে পারছিল, মুহুর্মুহু বরফের চাই ফাটার ধাক্কায় পাহাড়টা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। বাট্টাহালিডের দিক থেকে ভেসে এল চীৎকার, কান্না-কাটির শব্দ। বিরাট-বিরাট বরফের চাঁই পাহাড়ের নীচে ভেঙে পড়তে লাগলো। গীর্জা, রাজবাড়ি আর অন্য সব পাথরের বাড়ি-ঘর ভেঙে পড়ল। গীর্জার চূড়ার কাঠের ক্রুশটা ভেঙে পড়ল। শুধু রাজবাড়িটার বিশেষ কোন ক্ষতি হলো না! তবে জলের প্রচণ্ড ধাক্কা থেকে রেহাই পেল না কিছুই।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চললো বরফ ফাটার শব্দ এবং জলস্রোত। ফ্রান্সিসরা ততক্ষণ অপেক্ষা করল পাহাড়ের ওপাশে। তারপর সবাই আসতে লাগল বাট্টাহালিডের দিকে। প্রান্তরের বরফ আর শক্ত নেই। যেখান দিয়ে জলধারা বয়ে গেছে, সেখানে বরফ আর কাদায় জায়গাটা দুর্গম করে তুলেছে। তারই মধ্যে দিয়ে ওরা হেঁটে চললো।

ওরা যখন বাট্টাহালিডে ঢুকল দেখলো, এখানে-ওখানে ইউনিপেড্ সৈন্যরা মরে পড়ে আছে। একটা টুপিকও দাঁড়িয়ে নেই, সব ভেসে গেছে। শুধু রাজবাড়ি আর চূড়াভাঙা গীর্জাটা দাঁড়িয়ে আছে। রাজবাড়িটার অনেক জায়গায় পাথরের দেওয়ালের পাথর খসে পড়েছে। ফ্রান্সিস ভেবেছিল, এই জলধারায়, ইউনিপেড্ সৈন্যরা ভেসে গেছে। কিন্তু রাজবাড়ির কাছাকাছি আসতেই, বেশ কিছু সৈন্যকে রাজবাড়ি থেকে আসতে দেখলো।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এখনও কিছু ইউনিপেড্ আছে। তোমরা তাদের মোকাবিলা করো। আমি গীর্জাটায় যাচ্ছি।'

ফ্রান্সিস একা গীর্জার দিকে চললো। এর মধ্যেই ভাইকিংদের সঙ্গে অবশিষ্ট ইউনিপেডদের রাস্তায়, রাজবাড়িতে লড়াই শুরু হয়ে গেল। ইউনিপেডরা কুঠার চালাতে ওস্তাদ। ভাইকিংরা কুঠার ফেলে তরোয়াল বের করে ওদের সঙ্গে লড়তে লাগলো। চাঁদের মৃদু আলোয় এই লড়াই চললো। উভয়পক্ষের চীৎকার ছুটো-ছুটিতে বাট্টাহালিড্ জেগে উঠলো।

ফ্রান্সিস গীর্জাটার দরজায় এসে দাঁড়ালো। দরজাটা হাঁ করে খোলা। বোঝা গেল, তালাটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। ও ভেতরে ঢুকল। অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়ছে না। তবে জানালা দিয়ে যে অল্প চাঁদের আলো আসছিল, তা'তে দেখলো, জানালার কাঁচ অনেকটা জায়গায় ভেঙে গেছে। কেমন ফাঁকা লাগছে বেদীটা। সেই আলোতেই ও দেখলো, যীশুর বড় মূর্তি'টা মেঝেয় পড়ে আছে। হয়তো জলের ধাক্কায় পড়ে গেছে। কিন্তু কিভাবে কোথায় পড়ে আছে, দেখা যাচ্ছে না। ও মেঝের কাছে কড়াটার কাছে গেল। দেখলো, একটা মশাল আটকানো রয়েছে। চক্‌মকি ঠুকে মশাল জ্বালতে গেল। কিন্তু বরফজলে ভেজা মশাল সহজে জ্বলতে চায় না। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর মশাল জ্বললো। মশালের আলোয় দেখলো, যীশুর মূর্তি'টা মেঝেয় উবু হয়ে পড়ে আছে। একটা হাত ভেঙে গেছে। ও মূর্তি'টা তোলার জন্য হাত লাগালো। উঃ অসম্ভব ভারী। কয়েকজন মিলে ছাড়া তোলা যাবে না। এটা একার কর্ম' নয়।

হঠাৎ দরজায় একটা ধাক্কার শব্দ হলো। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। মশালের অল্প আলোয় দেখলো, কে যেন ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ও ভাবল, কোন ভাইকিং বন্ধু বোধহয়। পরক্ষণেই ভুল ভাঙল, লোকটার হাতে কুঠার। ভাইকিংদের হাতে তো কুঠার থাকার কথা নয়। ও মূর্তি'টা ডিঙিয়ে পেছিয়ে এলো।

ভালোভাবে আলো পড়তেই দেখলো রক্তমাখা কুঠার হাতে রাজা এভালডাসন। মুখটা হিংস্র, চোখের দৃষ্টি কুটিল। ও বুঝলো, এই অসভ্য বর্ব'র রাজা সুযোগ পেলেই তাকে হত্যা করবে। বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না। ফ্রান্সিসও সেইভাবে নিজেকে তৈরী করে নিল। এক ঝটকায় খাপ থেকে তরোয়াল খুলে ফেলল।

রাজা এভাল্ডাসন একবার দাঁত বের করে হাসল। বিড়-বিড় করে ওর নিজের ভাষায় কি বললো। তারপর কুঠার ওপরের দিকে তুলে কোপ দেওয়ার ভঙ্গীতে ছুটে এলো ওর দিকে। ও তৈরীই ছিল, একপাক ঘুরেই তরোয়াল চালালো। রাজার টুপিটা কেটে গেল, রক্ত বেরলো। রাজা আবার কুঠার উঁচিয়ে আসতেই তরোয়াল চালালো ফ্রান্সিস। কুঠারের সঙ্গে তরোয়াল লেগে ঝন্‌ঝন শব্দ উঠলো। কুঠারের সঙ্গে লড়াই করতে ফ্রান্সিস অভ্যস্ত নয়। কাজেই বারবার সরে-সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে লাগল। আর সুযোগ পেলেই তরোয়াল চালিয়ে রাজাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো। ঐ মশালের আলোতে দু'জনের লড়াই চললো। দু'জনেই পরিশ্রান্ত হলো। জোরে-জোরে শ্বাস পড়তে লাগলো দু'জনের।

ফ্রান্সিস ক্লান্ত হলো বেশী। কারণ সন্ধ্যের পর থেকে ও একরকম বিশ্রামই পায় নি। অতটা পথ হেঁটেছে, পাহাড়ে উঠেছে, খাল কেটেছে, তারপর কাদা-বরফের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এখানে এসেছে। এই মোকাবিলার আগে একটু বিশ্রামের দরকার ছিল। কিন্তু এখন আর সে-সব ভেবে লাভ নেই। সম্মুখে মৃত্যুদূতের

মতো দাঁড়িয়ে রাজা এভাল্ডাসন। হিংস্র বর্বর রাজা। ফ্রান্সিস নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চললো লড়াই। ও বেশ বুঝতে পারল, তার দম ফুরিয়ে আসছে। জোরে-জোরে হাঁপাতে লাগলো ও।

এক সময় রাজা এপাশ-ওপাশ কুঠার ঘোরাতে-ঘোরাতে এগিয়ে এলো। একবার কুঠারের ফলাটা ওর প্রায় মাথা ছুঁয়ে গেল। ও সঙ্গে-সঙ্গে তরোয়াল চালালো, রাজার মাথাটা লক্ষ্য করে। কিন্তু রাজা দ্রুত মাথা সরিয়ে নিল। কোপটা পড়ল রাজার কাঁধে। কাঁধ থেকে গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরিয়ে এলো। কিন্তু তরোয়ালটা বের করে নিয়ে আসার আগেই রাজা কুঠারটা তুলে মারতে উদ্যত হলো। ও মেঝেয় পড়ে থাকা যীশুর মূর্তিতে পা লেগে বেদীর ওপর চিৎ হয়ে পড়ল। ঠিক মাথার ওপর রাজার উদ্যত কুঠার। ডান কাঁধে তরোয়ালের গভীর ক্ষতের জন্য রাজা কুঠারটা সবল হাতে ধরতে পারছিল না। তবু ঐ অবস্থাতেই কুঠারের ঘা দিলে ওর বুকেই সেটা লাগবে।

ফ্রান্সিসের তখন অসহায় অবস্থা। কিন্তু কুঠারের ঘা'টা নেমে আসার আগেই হঠাৎ রাজার হাতটা কেমন যেন অবশ হয়ে এলো। হাত থেকে কুঠারটা পড়ে গেল মেঝেয়। রাজা হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। ও এক ধাক্কায় রাজাকে সরিয়ে দিল। বেদীর গা থেকে গড়িয়ে রাজা উপুড় হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। ও দেখলো, রাজার পিঠে একটা কুঠার আমূল বিঁধে আছে। মুখ তুলে দেখলো, দরজার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে। লোকটা এগিয়ে আসতে ও দেখলো, নেসার্ক। তাহ'লে নেসার্ক-ই দূর থেকে কুঠার ছুঁড়ে মেরেছে—নির্ভুল নিশানা।

নেসার্ক কাছে এলে ফ্রান্সিস হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো, 'নেসার্ক—তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। রাজার কুঠারের শেষ ঘা'টা আমি বোধহয় এড়াতে পারতাম না।'

ও দেখলো, নেসার্কের চোখে জল। সে মৃদুস্বরে কাঁদো-কাঁদো গলায় বললো 'শেষ অবধি বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি নিয়েছি।'

এমন সময় আরো কয়েকজন ভাইকিং এসে গীর্জায় ঢুকল। তারা ফ্রান্সিসকে অক্ষত দেখে খুশীই হলো। ওরা বললো, 'ফ্রান্সিস, ইউনিপেড্‌দের প্রায় সবাই মারা গেছে, বাকীরা পালিয়েছে। এখন বাট্টাহালিড্‌ ওদের হাত থেকে মুক্ত।'

ফ্রান্সিস হাসল, তারপর পাথরের বেদীটায় হেলান দিয়ে বসল। ভাইকিংরা ঘুরে-ঘুরে গীর্জাটা দেখতে লাগল। একজন বেদীটার ওপরে উঠলো। দেখলো, আর ওপরে আর একটা কাঠের বেদী। ও জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা ফ্রান্সিস, এই কাঠের বেদীটার ওপর কী ছিল?'

—'ঐ যে মেঝেয় যীশুর মূর্তিটা আছে, সেটা বসানো ছিল।'

—'কিন্তু এই ঢোকানো গর্তটার মধ্যে কী যেন একটা রয়েছে?'

—'কী রয়েছে?'

—'একটা বইয়ের মত কিছু!'

—'বই?'

ফ্রান্সিস কথাটা বলেই মেঝে থেকে লাফিয়ে তাড়াতাড়ি বেদীটার ওপর উঠলো। দেখলো, যে কাঠের বেদীটায় মূর্তিসুদ্ধ ক্রুশটা বসানো ছিল, তারমধ্যে চৌকোন গর্ত রয়েছে। একটা লাল মলাটের মত কিছু দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে উঠলো,

'শীগগির মশালটা নিয়ে এসো।'

একজন ছুটে গিয়ে মশালটা নিয়ে এলো। ও দেখলো, ঠিক এরিক দ্য রেডের 'ওল্ড টেস্টামেণ্টে'র বইয়ের মত লাল মলাট। ও বইটা আস্তে-আস্তে বের করে মলাট ওল্টাল। লেখা দেখলো, 'নিউ টেস্টামেণ্ট।' এই বইটার কথা রাজা সোকাসন বলেছিলেন। কিন্তু এই বইটা কোথায় আছে, তা কেউ জানত না। সেই চামড়ার তৈরী কাগজে এরিক দ্য রেডের নিজের হাতে লেখা। সেই প্রথম অক্ষরগুলো লাল কালিতে মোটা করে লেখা। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো। ইচ্ছে হলো, তখনই অক্ষর গুলো মেলায়। কিন্তু শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। প্রায় অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে। শরীর আর চলছে না, মনও আর কিছু ভাবতে পারছে না। ওদিকে ভোর হয়ে এসেছে, বাইরে ফ্যালকন পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস বইটা হাতে নিয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কয়েকজন চলে যাও। আমাদের তাঁবু জিনিসপত্র শ্লেজগাড়িগুলো সব এখানে নিয়ে এসো। এখানে সবকিছু জলে ভিজে গেছে। শুকনো বিছানাপত্র খাবার চাই।' কথাটা বলে ক্লান্ত পায়ে গীর্জার দরজার দিকে এগুলো। আর সবাই ওর পেছনে-পেছনে আসতে লাগল।

গীর্জার বাইরে এসে নেসার্ক ফ্রান্সিসকে বললো, 'আমি আমাদের টুপিকে যাচ্ছি।'

ও মাথা নেড়ে বললো, 'বেশ—কিন্তু তোমাকে কালকেই কোর্টল্যান্ড রওনা হতে হবে। রাজা সোকাসনকে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

—'ঠিক আছে, আমি কালকেই যাবো।' নেসার্ক কথাটা বলে চলে গেল।

যে ঘরটায় ফ্রান্সিস আর হ্যারি আস্তানা নিয়েছিল, সেই ঘরটার সামনে ও এলো। শ্লেটপাথরের দরজা সরিয়ে ও ভেতরে ঢুকল। তখন আলো ফুটেছে, সেই ম্লান আলোয় দেখলো, বিছানার সবকিছু ভিজে গেছে। ভেজা বিছানাটা মেঝেয় ফেলে দিল ও। তারপর পাথরের ওপর শুয়ে পড়ল। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

তখন বেশ বেলা হ'য়েছে। এতক্ষণ কেউ আর ফ্রান্সিসকে ডাকে নি। ও একটু ঘুমিয়ে নিল। সবাই তাঁবু খাটাতে, জিনিসপত্র গোছ-গাছ করতে ব্যস্ত। এমন সময় ওরা দেখলো নেসার্ক শ্লেজগাড়ি চালিয়ে আসছে। নেসার্কে'র সঙ্গে ও কে ব'সে? এ কী। এ যে হ্যারি! কাছাকাছি যারা ছিল গিয়ে গাড়ি ঘিরে দাঁড়াল। সে কি উল্লাস তাদের। হ্যারি বেঁচে আছে? অন্যরাও খবর পেল। হ্যারি গাড়ি থেকে নামতে সবাই ওকে এক-এক ক'রে জড়িয়ে ধরল। হ্যারি হাত নাড়ছিল আর হাসছিল। হ্যারিকে বেশ রুগ্ন দেখাচ্ছিল। তবু বেঁচে আছে তো। সবাই হৈ-হৈ করতে-করতে ছুটল, ফ্রান্সিসের ঘরের দিকে। আচমকা এই হৈ-চৈতে ফ্রান্সিস ঘুম ভেঙে গেল। ও চোখ কচলাতে-কচলাতে উঠে বসলো।

বন্ধুরা চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'হ্যারি বেঁচে আছে, হ্যারি বেঁচে আছে।'

ফ্রান্সিস নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তখনই হ্যারি ঘরে ঢুকল। সে এক লাফে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরল। ওর চোখ বেয়ে জলের ধারা নামলো। হ্যারির চোখও শুকনো রইল না। হ্যারি বেশ জোর ক'রে ফ্রান্সিসের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হ'ল। দু'জনেই হাসি-হাসি মুখে দু'জনের

দিকে তাকিয়ে রইলো।

এক সময় ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কী হ'য়েছিল হ্যারি ?'

—'সে এক কাণ্ড !' হ্যারি বলতে লাগলো, 'জানো তো আমার মৃগীরোগের মত একটা অসুখ হ'য়েছে। তোমার মনে আছে বোধহয়, জাহাজে একবার অজ্ঞানের মত হ'য়ে গিয়েছিলাম।'

—'হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে।' ফ্রান্সিস বললো।

—'এখানেই একদিন রাত্রে আমার ও-রকম হ'ল। বোধহয়, যে আমাকে রাতের খাবার দিতে এসেছিল, সেই পাহারাদারটাই আমাকে ঐ অবস্থায় প্রথম দেখে। জানি-না ওরা বৈদ্য-টদ্য ডেকেছিল কিনা। বোধহয় নয়। নিজেরাই ধ'রে নিয়েছিল, আমি মরে গেছি। তারপর আমাকে ওরা সাক্কারটপ পাহাড়ের দু'টো বরফের ফাটলের মধ্যে রেখে আসে। যখন আমার জ্ঞান ফিরলো দেখি, বরফের ফাটলের মধ্যে আমি প'ড়ে আছি। একে শরীর দুর্বল তার ওপর ভয়ানক ঠান্ডায় তখন হাত-পা অসাড় হ'য়ে গেছে ! ভেবে দেখলাম, এইভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে পড়ে থাকলে আমার মৃত্যু অবধারিত। কাজেই শরীরের অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে উঠে বসলাম। তারপর দাঁড়ালাম। দেখলাম, পায়ের কোন সাড় পাচ্ছি না। কোনরকমে ফাটলের বাইরে এলাম। কোথায় যাবো এবার ? বাট্টাহালিডে যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। হঠাৎ মনে পড়ল, পাহাড়ের ও'পাশে নেসার্কের টুপিক আছে। তুমি আর আমি ওখানে এবার গিয়েছিলাম।' হ্যারি থামলো।

—'তারপর ?'

—'অসাড় পা দু'টো হিঁচড়ে-হিঁচড়ে চললাম পাহাড় পেরিয়ে। তখনই গলা-জলের জলাশয়টা আমি দেখেছিলাম। অপূর্ব সেই দৃশ্য। বরফের ওপর শুয়ে বিশ্রাম করি, আবার চলি। এভাবে পাহাড়ের ওপরে গিয়ে পেঁছিলাম। তখন ভোর হ'য়ে গেছে। আকাশ পরিষ্কারই ছিল। নেসার্কের টুপিকটা দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আর চলার ক্ষমতা নেই তখন। বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে চললাম। একটু থামি, দম নি, তারপর আবার শরীরটা বরফের ওপর দিয়ে হিঁচড়ে চলি। অনেক কষ্টে নেসার্কের টুপিকের সামনে এলাম। নেসার্কের মা তখন চামড়া শুকোতে দিচ্ছিল। আমাকে দেখে ঠিক চিনল না। আমার তখন কথা বলার শক্তিও নেই। নেসার্কের মা আমাকে ধ'রে-ধ'রে টুপিকের মধ্যে নিয়ে গেল। কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বাললো। তারপর আমার গায়ে, হাতে-পায়ে সেঁক দিতে লাগলো। কিছুক্ষণ সেঁক চললো। আমি আস্তে-আস্তে হাত-পায়ের সাড় পেলাম। একটু পরেই বেশ সুস্থ বোধ করলাম। নেসার্কের মা আমাকে গরম-গরম স্যুপ খেতে দিল। একটু পরেই বেশ সুস্থ বোধ করলাম। আমি বারবার নেসার্কের মাকে ধন্যবাদ দিলাম। তারপর ওখানেই থেকে গেলাম। নেসার্কের মাকে অবশ্য বললাম, আমরা নেসার্কের সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। কিন্তু বুড়ী মা আমার কোন কথাই বুঝল না। তার ছেলের মত আমাকে সেবা ক'রে একেবারে সুস্থ ক'রে তুললো।'

—'তারপর থেকে ওখানেই রইলে ?'

—'হ্যাঁ। অবশ্য ভেবেছিলাম শ্লেজগাড়ি চড়ে কোর্টল্ড যাবো। কিন্তু গাড়ি

পাই নি ওখানে। তাছাড়া শরীরও দুর্বল, সাহস পেলাম না।' একটু থেমে বললো, 'নেসাকের তাঁবুতেই অপেক্ষা করতে লাগলাম তোমাদের জন্যে। তারপর গত রাতে ঘন-ঘন বরফের চাঁই ভাঙছে কেন, প্রথমে বুঝলাম না। একটু ভেবে চিন্তে বুঝলাম. পাহাড়ের ওপরের দিকে যে সরোবরটা দেখেছিলাম, তার জলের ধারা নেমে আসাতেই বরফের চাঁই ভাঙছে, তাই পাহাড়টা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। বুঝলাম, খাল কেটে জল নামানো হয়েছে, আর এর পেছনে তুমি আছো। তখন মনে-মনে সহস্রবার তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করলাম। তারপর সকালেই নেসাক এলো। সব শুনলাম ওর কাছে।'

এতক্ষণ ফ্রান্সিস গভীর মনোযোগের সঙ্গে হ্যারির কথা শুনছিল। হঠাৎ ওর মনে পড়ল, যীশুর বেদিতে পাওয়া এরিক দ্য রেডের 'নিউ টেস্টামেন্ট' বইটার কথা। ও তাড়াতাড়ি জোব্বার পকেট থেকে বইটা বের করে বললো, 'এই বইটা দেখো।'

—'এটা তো এরিক দ্য রেডের লেখা বাইবেল—আগেই দেখেছি।'

—'সেটা ছিল একই রকম দেখতে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'। এটা 'নিউ টেস্টামেন্ট'—অন্য খণ্ডটা।'

—'কোথায় পেলে এটা?'

হ্যারি সাগ্রহে বইটা হাতে নিল। ফ্রান্সিস কী করে বইটা পেল, রাজা এভাল্ডাসনের মৃত্যু—সব বললো।

হ্যারি আস্তে-আস্তে বললো, 'এবার বোঝা যাচ্ছে ঐ সাংকেতিক কথাটার অর্থ—'যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো।' অর্থাৎ যীশুর মূর্তির পায়ে নিচেই ছিল এটা'।

মাথা নীচু ক'রে কিছুক্ষণ ভাবলো হ্যারি। তারপর মাথা তুলে বললো, 'ফ্রান্সিস এই বইটাতে নিশ্চয়ই অন্য কোন সংকেত আছে।'

মুখ ফিরিয়ে নেসাককে বললো, 'রাজবাড়ি থেকে আমাদের জন্যে এক টুকরো কাগজ আর কালি-কলম নিয়ে এসো।'

তারপর ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি শুয়ে বিশ্রাম কর। আমি সংকেতটা উদ্ধার করছি।'

—মাথা খারাপ? তুমি সংকেত উদ্ধার করবে, আর আমি শুয়ে থাকবো? উঁহু সেটি হবে না। আমার বিশ্রাম নেওয়া হ'য়ে গেছে।'

একটু পরেই নেসাক কাগজ-কলম নিয়ে এলো। দুই বন্ধু বইটার ওপর ঝুঁকে পড়লো। হ্যারি বইটার পাতা পেছন থেকে ওল্টাতে লাগলো আর প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথম মোটা অক্ষরটা ব'লে যেতে লাগলো আর লিখতে লাগলো। নেসাক, সাঙখু আর ভাইকিং বন্ধুরা অবাক হ'য়ে দুই বন্ধুর কাণ্ড দেখতে লাগলো। হ্যারি সবগুলো অক্ষর বললো। লেখা হ'ল সব অক্ষরগুলো। দুই বন্ধু উত্তেজনায় ঝুঁকে পড়ল কাগজটার ওপর। স্পষ্ট অর্থবহ কথা, 'যীশুর দৃষ্টির সম্মুখে কিছুই গোপন থাকে না।' দুই বন্ধু মুখ চাওয়াচায়ি করলো। ফ্রান্সিস বললো, 'কী বুঝছো হ্যারি?'

—'আমার মনে হয়, এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন ঐ গীর্জাতেই আছে। যীশুর মূর্তি তৈরী করা এবং এখানে বেদীর ওপর রাখার পেছনে নিশ্চয়ই এরিক দ্য রেডের কোন উদ্দেশ্য ছিল।'

—'তা-তো বুঝলাম। কিন্তু এই সংকেত থেকে গুপ্ত ধনভাণ্ডারের হদিশ পাবে?'

—'নিশ্চয়ই পাবো। তবে গভীরভাবে ভাবতে হ'বে। সেইজন্যে সময় চাই।'

—'বেশ ভাবো।' ফ্রান্সিস বললো।

বন্ধুরা সবাই চলে গেল। দুই বন্ধু পাথরের ওপর ব'সে রইলো। একটু পরে সাঙখু আর দু'জন ভাইকিং শুকনো চামড়া দিয়ে ওদের বিছানা তৈরী ক'রে দিয়ে গেল। হ্যারি বিছানায় শুয়ে কাগজের লেখাটা পড়তে লাগলো। সেই দিনটা ওরা শুয়ে-ব'সে ঘরেই কাটাল। বাইরে বেরোলো না।

পরদিন নেসার্ক'কে ওরা কোর্ট'ল্ড পাঠাল রাজা সোক্কাসনকে এখানে নিয়ে আসতে। তাঁর রাজত্ব তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই একটা কর্তব্য শেষ হবে।

নেসার্ক বল্‌গা হরিণটানা গাড়িটা নিয়ে রওনা হ'য়ে গেল।

দু'জনে ঘরের দিকে ফিরে আসছে, তখনই ফ্রান্সিস বললো, 'হ্যারি, তুমি তো এসে গীর্জাটাকে দেখো নি।'

—'না।'

—'জলের ধাক্কায় নীচুদিকের জানালাটার কাঁচ ভেঙে গেছে, গীর্জার মাথার ক্রুশটা ভেঙে গেছে, মূর্তি'টাও মেঝের ওপর পড়ে আছে। একবার দেখে আসি চলো।'

—'বেশ চলো।' এই বলে গীর্জার দিকে যেতে-যেতে ফ্রান্সিস তিন-চারজন ভাইকিং বন্ধুকে ডেকে নিল।

ওরা গীর্জার সামনে গিয়ে পৌঁছল। ফ্রান্সিসের মাথায় তখনও ঐ সাংকেতিক কথাটা 'যীশুর দৃষ্টির সম্মুখে কিছুই গোপন থাকে না' ঘুরছিল। ও নানাভাবে কথাটা ভাবতে-ভাবতে গীর্জার অন্ধকার পরিবেশে ঢুকলো। ভাঙা জানালার মধ্য দিয়ে যেটুকু আলো আসছে, তাতেই যা দেখা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বন্ধুদের বললো, 'মূর্তি'টা তুলে বেদীতে বসাতে হ'বে। হাত লাগাও সবাই।'

সবাই মূর্তি'টার কাছে এল। ধরাধরি ক'রে মূর্তি'টা তুললো। তারপর কাঠের বেদীটায় বসাতে গিয়ে দেখলো, উল্টোমুখো হ'য়ে যাচ্ছে।

হ্যারি ব'লে উঠলো, 'আরে উল্টো হয়ে যাচ্ছে, সোজা ক'রে বসাও।'

কথাটা ফ্রান্সিসের কানে যেতেই ও চমকে উঠলো। পর-পর কয়েকটা কথা ওর মনে বিদ্যুৎঝলকের মত খেলে গেলো, 'যীশুর চরণে বিশ্বাস রাখো', পায়ের নীচেই পাওয়া গেল বাইবেলের পরের খণ্ড, দু'টো বইয়েরই উল্টো দিক থেকে অক্ষর সাজিয়ে অর্থময় ইঙ্গিতপূর্ণ কথা পাওয়া গেছে, মূর্তি'টার মুখও যদি উল্টোদিকে করা যায়, 'যীশুর দৃষ্টির সম্মুখে কিছুই গোপন থাকে না।'

উল্টোদিকের মুখ দৃষ্টির লক্ষ্য। কিসের দিকে সেই দৃষ্টি? ফ্রান্সিস চীৎকার ক'রে উঠলো, 'মূর্তি'টা উল্টোদিকে মুখ ক'রেই রাখো। দেখো রাখা যায় কিনা।'

সকলেই ফ্রান্সিসের এই কথায় আশ্চর্য হ'ল। হঠাৎ উল্টোমুখী ক'রে মূর্তি রাখার কল্পনা ওর মাথায় এলো কেন? যাহোক ওরা মূর্তি'টা উল্টোমুখী ক'রে বেদীতে বসাল। আশ্চর্য! ঠিক মাপে আটকে গেলো।

ফ্রান্সিস পায়ের জুতো খুলে ফেললো। তারপর এক লাফে বেদীটার ওপর উঠলো। ওর কাঁধের কাছে পেতলের মূর্তি'টা। ফ্রান্সিস মূর্তি'টার মুখের কাছে মুখ আনল। মূর্তি'র চোখের দৃষ্টিটা সামনের দিকে নয়। একটু তেরচা। আশ্চর্য!

ফ্রান্সিস চিৎকার ক'রে ডাকলো, 'হ্যারি, শীগগির উঠে এসো।'

হ্যারিও জুতোটা খুলে উঠলো।

ও বললো, 'হ্যারি, মূর্তিটার দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে তাকাও।'

হ্যারিও মূর্তিটার মুখের কাছে মুখ এনে দৃষ্টির লক্ষ্য স্থির ক'রে তাকিয়ে চমকে উঠলো। আশ্চর্য! সেই মেঝের কাছাকাছি বাঁ-দিকের আংটাটা। ও বলে উঠলো, ফ্রান্সিস, আংটাটা।'

ফ্রান্সিস তখন ঘর-ময় পায়চারী করতে-করতে বলছে 'মেঝের অত কাছে আংটা— মশাল রাখবার জন্যে? অসম্ভব?' পায়চারী থামিয়ে ব'লে উঠলো, এরিক দ্য রেডের গুপ্ত-ধনভাণ্ডার আমাদের হাতের মুঠোয়। ঐ আংটায় আটকানো পাথর সরাতে হ'বে। সবাই. যাও, কুঠার নিয়ে এসো। পাথরের খণ্ডগুলো আলগা ক'রে তুলতে হবে।'

হ্যারি বেদী থেকে এক লাফে নেমে এলো। ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধ'রে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, 'সাবাস্ ফ্রান্সিস—সাবাস্। তুমি সংকেতটা ঠিক ধরতে পেরেছ।'

ফ্রান্সিস তখন নীচু হ'য়ে আংটাটা যে পাথরের গায়ে ওটা পোঁতা আছে, সেটা পরীক্ষা করতে লাগলো। দেখলো, পাথরটা বেশ বড়।

বন্ধুরা কুঠার নিয়ে এসে হাজির হ'ল। ফ্রান্সিস ওদের বললো, 'দু'জন দু'দিক থেকে পাথরের জোড়ের খোঁজে কুঠারের কোপ বসাও।'

দু'জন দু'দিকে দাঁড়িয়ে কুঠারের কোপ বসাতে লাগলো। কিন্তু অনভ্যস্ত হাতের কোপ ঠিক জোরে পড়ছিল না। ওদিকটা কিছু অন্ধকার থাকাতেই এটা হয়তো হচ্ছে।

ফ্রান্সিস বললো, মশাল জ্বালিয়ে আনো।'

মশাল আনা হলো অল্পক্ষণের মধ্যেই। আবার কুঠার চালালো ওরা, কিন্তু ঠিক জোরে লাগলো না। পাথরের চাকলা উঠে এলো শুধু। এর মধ্যেই মুখে-মুখে সবাই জেনে গেছে যে, গুপ্ত ধনভাণ্ডার খোঁড়া হচ্ছে। সবাই এসে ভীড় করে দাঁড়ালো। ফ্রান্সিস মুখ তুলে সকলের দিকে তাকালো। বললো, 'নেসাক' নেই, মুস্কিল হলো।'

হঠাৎ সাঙখুর দিকে নজর পড়লো। ভালুক শিকারী ও, কুঠার চালাতে ওস্তাদ। ফ্রান্সিস তাকে ডেকে বললো, 'ঠিক পাথরের জোড়ের ওপর কুঠার চালাও। পাথরটা তুলে নিতে হবে'।

সাঙখু কুঠার হাতে এগিয়ে এলো। ঠিক জোড়ের মুখে কুঠারের কোপ পড়তে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথরটা আলগা হয়ে গেল। ফ্রান্সিস সাঙখুকে থামতে বললো। তারপর আংটাটা ধরে টানতে লাগলো। বুঝলো, পাথরের জোড় এখনও খোলে নি। আবার সাঙখু কুঠার চালাতে লাগলো। পাথরটা আরো আলগা হতে ফ্রান্সিসের নির্দেশে থামল ও। তারপর হাঁপাতে লাগলো। ফ্রান্সিস কয়েকজনকে একসঙ্গে আংটাটা ধরে টানতে বললো। চার-পাঁচজন মিলে আংটাটা ধরে টানতে লাগলো। আস্তে-আস্তে পাথরটা দেয়াল থেকে বেরিয়ে এলো। আরও কয়েকটা হ্যাঁচকা টান পড়তেই হুড়-মুড় করে পাথরটা খুলে এলো। ফ্রান্সিস মশালটা নিয়ে খোঁদলের কাছে ধরে দেখলো, সিঁড়ির মতো পাথর পাতা। কিন্তু আরো পাথর না খসালে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—নামবার সিঁড়ি কিনা? একটা পাথর খুলে আসতে খুব সুবিধে হলো। আশে-পাশে পাথরগুলোর জোড় আলগা হয়ে গেল। দু'একজন

মিলে টানতেই পাথরগুলো খুলে আসতে লাগলো।

ফ্রান্সিস মশাল এগিয়ে দিয়ে দেখলো, একটা গহ্বরের মতো। নীচের দিকে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে। অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ও কিছুক্ষণ মশাল হাতে দাঁড়িয়ে, ভেতরের বন্ধ বাতাসটা বেরিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করল। তারপর মাথা নীচু করে ঢুকে দেখলো, ভেতরটা বেশ বড়। মাথা না নামিয়ে ও সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলো। পেছনে-পেছনে চললো হ্যারি।

একটা ঘরের মতো জায়গায় এসে সিঁড়িটা শেষ হয়েছে। ঘরটার দেয়াল পাথরের তৈরী। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট কাঠের বাক্স। সোনার পাত দিয়ে বাক্সটায় নানা কারুকাজ করা। মিনে করা আছে তা'তে। মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠলো মিনে করা সোনার পাত। বাক্সটা বেশ পরিষ্কার, ঠাণ্ডা ও বরফের দেশ বলেই বাক্সটায় ধুলোর আস্তরণ পড়ে নি।

বাক্সটার খোলার দিকটায় দেখা গেল, একটা রুপোর তালা ঝুলছে। রুপোর তালাটাতেও মিনের কাজ করা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। লা ব্রুশের গুপ্তধনের বাক্সগুলোর দ্বিগুণ এই বাক্সটা। ওরা দু'জনেই বাক্সটার কারুকাজ দেখে অবাক হলো। হঠাৎ হ্যারি ওর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো, 'ফ্রান্সিস ডান কোণায় দেখো।'

ফ্রান্সিস মুখ তুলে ডানদিকে মশালটা বাড়াতে নিজে ভীষণভাবে চমকে উঠলো। দেখলো, এস্কিমোদের পোষাকপরা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। ডানহাতটা বাড়ানো। বোঝাই যাচ্ছে—মৃত মানুষ, ভীষণ শীতের দেশ বলেই অবিকৃত আছে মৃতদেহটা। কিন্তু বড় জীবন্ত। এবার ও মৃতদেহটার বাড়ানো হাতের দিকে লক্ষ্য করল। দেখলো, হাতের তোলায় একটা বড় আকারের সোনার চাবি। ও আস্তে-আস্তে হাত বাড়িয়ে চাবিটা তুলে নিল। কী ঠাণ্ডা মৃতের হাতটা।

চাবিটা দিয়ে তালা খুললো ফ্রান্সিস। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে বাক্সের ডালাটা খুলে ফেললো। দেখলো, মশালের আলোয় ঝিক্‌মিক্‌ করছে সোনার মোহর, হীরে-মুক্তো-চুনী-পান্না বসানো বিচিত্র সব অলঙ্কার। মোহর, অলঙ্কারে বাক্সটা ঠাসা। দামী মণি-মুক্তো বসানো খাপে-ভরা কয়েকটা ছোরা। কয়েকটা ছোট্ট সোনার কুঠার, মিনের কাজ করা তাতে।

ওদিকে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা বাইরে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কতক্ষণে এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন দেখবে। এদিকে সিঁড়ি দিয়ে একজনের বেশী নামা যায় না। ফ্রান্সিস ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল। বললো, 'হ্যারি, চলো আমরা বাইরে যাই। ওরা একে একে দেখে যাক্‌।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে পর-পর ওপরে উঠে এলো। ওরা আসতেই সবাই একজন-একজন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ধনভাণ্ডার দেখে যেতে লাগলো। দু'চারজন মৃত এস্কিমোটাকে দেখে ভয়ে চীৎকারও করে উঠলো। ওরা দেখে একে-একে ওপরে উঠে আসছে যখন, বিস্ময়ের ঘোর তখনও তাদের কাটে নি। এত ধনসম্পদ? একসঙ্গে?

সবারই দেখা হলো। ফ্রান্সিস তখন বললো, 'এবার বাক্সটা ঘরে নিয়ে যেতে হবে। এখানে এত ধনসম্পদ ফেলে রাখা যাবে না—কে-কে যাবে যাও।'

চার-পাঁচজন ভাইকিং তৈরী হলো। দু'জনের ঘরের ভেতরে নামল। বাক্সটার দু'পাশে দু'টো পেতলের কড়া। সেই দু'টো ধরে ওরা বাক্সটা সিঁড়ির কাছে নিয়ে এলো। বেশ ভারী বাক্সটা—বেশ পরিশ্রম হলো ওটা তুলে আনতে। অন্য দু'জন তখন একে-একে সিঁড়ি বেয়ে বাক্সটা বাইরে নিয়ে এলো। তারপর চারজন বাক্সটা কাঁধে তুলে নিয়ে গীর্জার বাইরে এলো। তারপর সবাই মিলে চললো, ফ্রান্সিসের আস্তানার দিকে। ওরা খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠলো। হৈ-হৈ করতে-করতে বরফ-কাদার মধ্যে দিয়ে চললো—গানও ধরল কে যেন।

ফ্রান্সিস ও হ্যারির ঘরে বাক্সটা রাখলো ওরা। তারপরেও এসব নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললো। তারপর নিজেদের তাঁবুতে, রাজবাড়ির যে-সব ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল, সে-সব ঘরে ফিরে গেলো।

পরের দিন ফ্রান্সিস আর হ্যারি ঘর থেকে বেরলো না। শুয়ে-বসে দিনটা কাটিয়ে দিল। রাত হলে ভাইকিংরা তাঁবুর সামনের আগুন জেবলে, অনেক রাত পর্যন্ত আনন্দ হৈ-হল্লা করলো। আগুনের চারপাশে ঘুরে-ঘুরে নাচল, গান গাইল।

পরের দিন, তখন বিকেল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের ঘরে বসে কথাবার্তা বলছে। ফ্রান্সিস বললো, 'বাবাকে কথা দিয়েছিলাম, দেড় মাসের মধ্যে ফিরবো। কিন্তু বোধহয় কথা রাখতে পারবো না। যা বুঝতে পারছি আরো কয়েকদিন দেরী হবেই। এখন রাজা সোক্কাসন এলে বাঁচি। সব ধনদৌলত তাঁর হাতে না তুলে দেওয়া পর্যন্ত, নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।'

ওরা এসব কথাবার্তা চলছে, তখনই একজন ভাইকিং এসে খবর দিল, 'রাজা সোক্কাসন নিজে এসেছেন।'

ফ্রান্সিস আর হ্যারি তৈরী হয়ে বাইরে বেরোতে যাবে, তার আগেই রাজা এসে ঘরে ঢুকলেন, পেছনে রানী। দু'জনেই মাথা নীচু করে সম্মান জানালো। রাজা ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরলেন। ও তখন ভাবছে, রাজা-রানীকে কোথায় বসাব? রাজার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বললো, 'আপনাদের কোথায় যে বসতে দি?'

রানী হেসে বললেন, 'আমরা এখানেই বসছি।'

রানী হ্যারির বিছানায় বসলেন, রাজা ফ্রান্সিসের বিছানায়। বসেই যখন পড়েছেন, তখন আর কী করা যাবে?

ফ্রান্সিস বললো, 'আপনারা তো এখনো এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন দেখেন নি।'

কথাটা শেষ করেই ও চাবি দিয়ে বাক্সটায় তালা খুলে ডালাটা তুললো। রাজা-রানী দু'জনেই বিস্ময়ে হতবাক। এত মূল্যবান সম্পদ?

রানী বিছানা থেকে নেমে কিছু গয়নাগাটি তুলে-তুলে দেখলো।

ফ্রান্সিস বললো, 'আপনারা এসে গেছেন। বাক্সটা লোক পাঠিয়ে রাজবাড়িতে নিয়ে যান। এবার আমাদের ছুটি দিন।'

রাজা কিছুক্ষণ বাক্সটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরস্বরে বললেন, 'এই গুপ্ত ধনভান্ডার তুমিই আবিষ্কার করেছ—এর সবটাই তোমার প্রাপ্য'।

ফ্রান্সিস বললো—'না মহারাজ। উত্তরাধিকার সূত্রে এই সম্পদ আপনারই প্রাপ্য।'

রাজা মাথা নাড়লেন, 'না, তা হয় না। তোমাকেই নিতে হবে এই ধনভান্ডার।'

হ্যারি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। এবার এগিয়ে এসে বললো, 'মহারাজ এবার আমি একটা কথা বলবো?'

—'বলো।'

—'বলছিলাম, আপনি যদি ফ্রান্সিসকে অর্ধেক ধনভাণ্ডার দেন, তাহ'লে আর কোন সমস্যাই থাকে না।'

ফ্রান্সিস ভেবে দেখলো, এ ছাড়া সমাধানের কোন পথ নেই। ও বললো, 'আপনি যখন আমাকে দিতেই চান, তখন অর্ধেক দিন। তাতেই আমি খুশী হবো।'

—'বেশ।' রাজা উঠে দাঁড়ালেন। রানী বিছানা ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললেন, 'আজ রাত্রে রাজবাড়িতে আপনাদের সকলের নিমন্ত্রণ। আসবেন কিন্তু।'

—'নিশ্চয়ই।' ফ্রান্সিস বললো। আবার ওরা রাজা-রানীকে সম্মান জানালো। রাজা ও রানী চলে গেলেন।

* * *

রাত্রে ফ্রান্সিসরাও রাজবাড়িতে খেতে গেল। একটা বড় ঘরে খাওয়ার আয়োজন করা হ'য়েছে। সব এস্কিমো সৈন্যরা ওদের মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। ফ্রান্সিসকে বসতে হলো রাজা ও রানীর মাঝখানে। নেসার্কের মুখে পরে ফ্রান্সিস শুনেছিল, এটা একটা নাকি দুর্লভ সম্মান। অন্য দেশের রাজা-মহারাজাকেই এই সম্মান দেওয়া হয়। অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া চললো। রাজা ওদের বিদায় জানাতে রাজবাড়ির প্রধান ফটক পর্যন্ত এলেন। তখনই ফ্রান্সিসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কবে ফিরে যাবেন?'

—'কালকে দুপুর নাগাদ আমরা দেশের উদ্দেশ্য রওনা হব।'

রাজা বললেন, 'ধনভান্ডার দু'ভাগ করার দায়িত্ব মন্ত্রীকে দিয়েছি। কাল সকালেই তোমার প্রাপ্য অর্ধাংশ পেঁছে দেওয়া হবে।'

একটু আমতা-আমতা ক'রে ফ্রান্সিস বললো, 'যদি কিছু না মনে করেন আর একটা অনুরোধ।'

—'বলো!'

—'ধনভাণ্ডারের বাক্সটা আমার খুব পছন্দ। বড় সুন্দর বাক্সটা।'

রাজা হেসে উঠলেন। বললেন, 'এ আর বেশী কথা কি। ওটা তোমাকেই দেব।'

ওরা রাজার কাছে বিদায় নিয়ে চলে এল নিজেদের আস্তানায়।

* * *

পরের দিন সকাল থেকেই শুরু হ'ল ভাইকিংদের কর্মতৎপরতা। সবাইকে হাত লাগালো জিনিস-পত্র গোছগাছ করতে। কথাবার্তা, ডাকাডাকিতে মুখর হয়ে উঠলো বাট্টাহালিড্। ওরা যাবার আয়োজনে ব্যস্ত, তখনই রাজার বল্গা হরিণে টানা স্লেজ-গাড়িটা নিয়ে নেসার্ক এল। গাড়িটায় এরিক দ্য রেডের অর্ধেক ধনভাণ্ডারসহ বাক্সটা রাখা। নেসার্ক ফ্রান্সিসকে বললো, 'রাজার নির্দেশ এই বাক্সটাসহ আপনাকে আঙ্গা-মাগাসালিখ বন্দর পর্যন্ত পেঁছে দিতে হবে।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই রওনা হবার জন্যে তৈরী হ'ল। রাজা সেকাসন, মন্ত্রী, কয়েকজন অমাত্য এলেন ওদের বিদায় জানাতে। রাজা ফ্রান্সিসকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে

ধরলেন। তারপর ফ্রান্সিস এসে গাড়িতে উঠলো।

যাত্রা শুরু হ'ল।

সকলেই খুশী। আবার স্বদেশে ফিরে যাচ্ছে। হৈ-হৈ ক'রে বরফের প্রান্তরের ওপর দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলো। দিনটা মেঘ আর কুয়াশায় মুক্ত। রোদ খুব উজ্জ্বল নয়। তবু অনেকদিন পর্যন্ত আলো ছড়ানো দেখা যাচ্ছে। চীৎকার ক'রে ওরা কুকুরগুলোকে উৎসাহ দিচ্ছে। বাতাসে চাবুকের ঘা-এর শব্দ উঠছে। বেশ জোরেই চললো শ্লেজগাড়িগুলো। সবার সামনে ফ্রান্সিসের গাড়ি। নেসার্ক চালাচ্ছে গাড়িটা। ও-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। তুষার আর বরফে ঢাকা প্রান্তরে পথ ব'লে কিছু থাকে না। শুধু দিক ঠিক ক'রে গাড়ি চালাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়, হিমবাহ আর গলা বরফের এলাকার দিকে। গাড়ি যেন হিমবাহ আর গলা বরফের মধ্যে গিয়ে না পড়ে। সামনে রয়েছে নেসার্ক। ও-ওর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে সব দিকে নজর রেখে চলেছে।

দু'দিন বেশ নির্বিঘ্নেই কাটল। কিন্তু কোর্টল্ড পেঁছিবার আগের দিন বিকেলের দিকে কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে এলো। ফ্রান্সিস গাড়িচালক সবাইকে নির্দেশ দিল গাড়ি থামিয়ে আসন্ন ঝড়ের মোকাবিলা করতে। নইলে ঝড়ের মধ্যে যেকোন গাড়ি দলছুট হ'য়ে যেতে পারে। ফ্রান্সিসের এই ব্যাপারে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। ওর নির্দেশমত গাড়িগুলো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরেই শুরু হ'ল তুষারবৃষ্টি, আর সেই সঙ্গে প্রবল ঝ'ড়ো হাওয়ার ঝাপ্‌টা। কেউ-কেউ কুকুরগুলোর আড়ালে, বরফের ওপর উবু হ'য়ে রইলো। ফ্রান্সিস এর আগেও তুষারঝড়ের কবলে পড়েছে। কিন্তু আজকের ঝড়টা আরো প্রচণ্ড। নাক-মুখ চাপা দিয়ে সে গাড়িতে ব'সে রইলো। প্রায় সকলেরই এক অবস্থা। শুধু নেসার্ক আর সাঙথু ঝড়ের মধ্যে বল্‌গা ও কুকুর-গুলোর পরিচর্যা করতে লাগলো। ওগুলোর গায়ে জমা তুষার পরিষ্কার ক'রে দিতে লাগলো। গাড়ির লাগাম, দড়ি-দড়া ঠিক করতে লাগলো।

ভাগ্য ভাল, অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝ'ড়ো হাওয়া কমলো। তুষারবৃষ্টিও কমে এলো। আবার যাত্রা শুরু হ'ল। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হ'ল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার গাঢ় হ'ল। রাত্রি নামলো। ওরা সে রাতের মত থামলো। তাঁবু খাটাল, রান্না ক'রে খাওয়া-দাওয়া সারলো। তারপর রাতের মত ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন আবার যাত্রা শুরু হ'ল। দুপুরের দিকে ওরা কোর্টল্ড পেঁছিল। একদিন পুরো বিশ্রাম নিল। তারপর আবার যাত্রা।

কয়েকদিন পরে আঙ্গা-মাগাসালিক বন্দরে পেঁছিল। পথে তুষারঝড়ের কবলে পড়তে হয় নি। যাত্রা নির্বিঘ্নেই শেষ হ'ল। পথে সাঙথু একটা শ্বেতভাল্লুক শিকার করেছিল। ছুরি দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ভালুকটার চামড়া ছাড়িয়ে গাড়িতে তুলে নিয়েছিল। হ্যারি একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিল। অবশ্য কোর্টল্ডে একদিন বিশ্রাম নিয়ে হ্যারি অনেকটা সুস্থ হ'য়ে উঠেছিল।

আঙ্গা-মাগাসালিকে ওরা পেঁছিল বিকেলের দিকে। তখনই চারিদিক প্রায় অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। শ্লেজগাড়িগুলো থেকে জিনিসপত্র নিয়ে একেবারে অন্ধকার হ'য়ে আসার আগে জাহাজে তোলা হ'ল। খুব উৎসাহের সঙ্গে সবাই কাজ ক'রে গেল।

রাত্রে জাহাজ চালানো বিপজ্জনক। কারণ, এখানকার সমুদ্রে বহুদূর পর্যন্ত হিমশৈল ভেসে বেড়াচ্ছে। কোন একটার সঙ্গে অন্ধকারে ধাক্কা লাগলে জাহাজডুবি হ'বে। কাজেই স্থির হ'ল সকলে রওনা হব। রাত্রি হ'ল। খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা নৌকো ক'রে তীরে এল। কালুটুলার তাঁবুতে গেল। কালুটুলা খুবখুশী হ'ল। আগুনজেবলেএস্কিমোরা আগুনের চারপাশে নাচছিল, ড্রাম বাজাচ্ছিল, গান গাইছিল। ওরা সেই নাচ-গানের আসরে যোগ দিল। অনেক রাত পর্যন্ত নাচ-গান চললো। তারপর জাহাজে ফিরেএল।

পরদিন নেসার্ক ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এল। ফ্রান্সিস নেসার্ককে জড়িয়ে ধরল। আবেগে ও কথা বলতে পারছিল না। নেসার্কেরও এক অবস্থা। ফ্রান্সিস বাক্স থেকে একটা মণিমুক্তোখচিত খাপওয়ালা ছোরা বের ক'রে রেখেছিল। সে ওটা নেসার্কের হাতে দিল। নেসার্ক নিতে রাজী হচ্ছিল না। তখন ফ্রান্সিস বললো, 'এটা তোমাদেরই অতীতের এক রাজার সম্পত্তি। এটা তোমারই প্রাপ্য।'

নেসার্ক নিল ছোরাটা। ওর চোখমুখ খুশীতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। ওর ওপর ফ্রান্সিসের কেমন একটা মায়া প'ড়ে গিয়েছিল। ও বার-বার ফ্রান্সিসকে ধন্যবাদ দিতে লাগলো। তারপর হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বল্‌গা হরিণে টানা স্লেজগাড়িটা নিয়ে চ'লে গেল।

এবার এস্কিমো সর্দার কালুটুলা আর সাঙখুর কাছ থেকে বিদায় নেবার পালা। ফ্রান্সিস আর হ্যারি কালুটুলার তাঁবুতে গেলো। জাহাজে যে ক'টা রঙীন কাপড় ছিল সব নিয়ে গেল। রঙীন কাপড়গুলো কালুটুলাকে উপহার দিল। কালুটুলা বারবার বলতে লাগলো, 'কুয়অনকা' অর্থাৎ 'তোমাকে ধন্যবাদ'! সাঙখুকে ওরা জড়িয়ে ধরল। ওদের জন্যে অনেক করেছে সাঙখু। ফ্রান্সিস দু'জনকে দু'টো মুক্তো দিল। ওরা রঙীন কাপড় আর মুক্তো পেয়ে খুব খুশী হ'ল। ওরা জাহাজে ফিরে এল। এবার স্বদেশের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা। দড়ি-দড়া ঠিক ক'রে পাল খাটিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। বরফের দেশ পেছনে পড়ে রইল। জাহাজ চললো দক্ষিণমুখো। সমুদ্রের জলে এখানে-ওখানে হিমশৈল ভাসছে। তার মধ্য দিয়ে ধাক্কা এড়িয়ে সাবধানে জাহাজ চালাতে লাগলো। ও খুব দক্ষ জাহাজচালক।

* * *

জাহাজ চলতে লাগলো। কয়েকদিন পরেই দেখা গেল, সমুদ্রে আর হিমশৈল ভাসছে না। এবার বেশ গরম বোধ হ'তে লাগলো। ভাইকিংরা এস্কিমোদের মাথা-ঘাড় ঢাকা পোষাক ছেড়ে তাদের পোষাক পরতে লাগলো। সমুদ্র শান্ত। বাতাসও বেগবান। পাল ফুলে উঠলো। জাহাজ চললো দ্রুত গতিতে। একদিন শুধু ঝ'ড়ো আবহাওয়ার মধ্যে পড়লো ওরা। কয়েক ঘন্টা পরেই সে আবহাওয়া আর রইলো না।

জাহাজ একদিন ভাইকিংদের দেশে পৌঁছলো। তখন দুপুরবেলা। বন্দর লোক-জনের ভীড় ছিল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ ভিড়লে অনেকেই ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে চিনলো। ওরা হৈ-হৈ ক'রে উঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিসদের ফেরার খবর রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়লো। হাজার-হাজার লোক জাহাজঘাটায় এসে ভীড় করলো। চীৎকার ক'রে বলতে লাগলো, 'ফ্রান্সিস তোমরা কি এনেছ, আমাদের দেখাও।'

অগত্যা ফ্রান্সিস ও বন্ধুদের এরিক দ্য রেডের বাক্সটা নিয়ে গিয়ে দেখাতে বললো।

ওরা বাক্সটা বাইরে নিয়ে এলো। কয়েকজন মিলে উঁচু ক'রে বাক্সটা দেখাতে লাগলো। হীরে-জহরৎ আর চুনী-পান্নার কারুকাজ করা ছোরা, কুঠার দেখে ওরা অবাক হ'য়ে গেল। এবার বন্ধুরা অনেকে এসে বললো, 'ফ্রান্সিস, অনেকদিন আমরা বাড়ি-ছাড়া। আমাদের বাড়ি যেতে দাও।'

ফ্রান্সিস কী আর করে। বললো, 'আমি আর হ্যারি থাকছি। রাজার সৈন্য না-আসা পর্যন্ত আরো কয়েকজন থাকো। বাকীরা বাড়ি যাও।'

অনেকেই জাহাজ থেকে নেমে ঘোড়ার গাড়ী ধরতে ছুটল। ফ্রান্সিস বিস্কোকে বললো, 'তুমি বাড়ি যাবার সময় রাজপ্রাসাদে আমাদের আসার সংবাদটা দিয়ে যেও'।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, বেশ কিছু বন্ধু জাহাজে ফিরে এলো। এক সময় বিস্কোও ফিরে এলো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি এর অর্থ বুঝলো না। কী ব্যাপার? ওরা সব ফিরে এলো কেন? ওরা সবাই কেমন ফ্রান্সিসকে এড়িয়ে-এড়িয়ে যেতে লাগলো। ফ্রান্সিস যত ওদের ফিরে আসার কারণ জানতে চাইল, ওরা ততোই কোন কথা না বলে সরে-সরে যেতে লাগলো।

হ্যারি এবার বিস্কোকে ধরলো। আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো, 'কী হয়েছে বলো তো? তোমরা ফ্রান্সিসকে অমন এড়িয়ে-এড়িয়ে যাচ্ছো কেন?'

বিস্কো একটু চুপ করে রইলো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'হ্যারি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, ফ্রান্সিসের মা দিন-পাঁচেক আগে মারা গেছেন। যারা বাড়িতে গেছে, তারাই খবরটা শুনেছে। ফ্রান্সিসের এই দুঃখের দিনে ওর পাশে না থেকে, বাড়িতে শুয়ে আরাম করবো? তাই ফিরে এসেছি।'

হ্যারি মহা সমস্যায় পড়লো। ওকে কীভাবে এই ভীষণ শোকাবহ কথাটা জানাবে? তখনই দেখলো, ফ্রান্সিস তার দিকেই আসছে। ও এসেই জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার বলো তো? ওরা এ-রকম ব্যবহার করছে কেন?'

হ্যারি নিজেও ফ্রান্সিসের মাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। এ-রকম মা পাওয়া ভাগ্যের কথা। এই খবর শুনে পর্যন্ত বুকে একটা টন্‌টনে ব্যথা ও অনুভব করছিল। প্রাণপণে সেই ব্যাথাটা সহ্য করছিল। একটু ধরা গলায় ও বললো—'তুমি বাড়ি যাও।'

—'সে-কি! তুমি একা থাকবে?'

—'তা কেন? বিস্কো থাকবে, যারা ফিরে এসেছে, তারাও থাকবে।'

ফ্রান্সিস এবার ঘুরে হ্যারির চোখের দিকে সরাসরি তাকাল। একটু গম্ভীরস্বরে বললো, 'কী ব্যাপার বলো তো? তোমাদের সকলের ব্যবহারেই আমি কেমন একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করছি। মনে হচ্ছে, তোমরা আমার কাছ থেকে কিছু লুকোচ্ছো!'

—'তুমি বাড়ি যাও।' হ্যারি সহজ গলায় বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারলো না। ওর গলার ব্যথা-কাতর ভাবটা চাপা থাকল না।

হঠাৎ রুদ্ধস্বর চীৎকার করে উঠলো ফ্রান্সিস, 'বাড়ি যাবো না আমি।'

তারপর দ্রুত এগিয়ে হ্যারির গলার কাছে জামাটা মুঠো করে চেপে ধরে দাঁতচাপা স্বরে বলে উঠলো, 'পরিষ্কার বলো, কী হয়েছে?'

হ্যারির প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলো। হ্যারি তবু চুপ করে রইলো। কোন কথা বললো না।

—'হ্যারি—ই—ই।' ক্রুদ্ধস্বরে ফ্রান্সিস বলে উঠলো।

হ্যারি শান্তস্বরে বললো, 'আমার জামা ছেড়ে দাও।'

ফ্রান্সিস ওর জামা ছেড়ে দিল। হ্যারি আগের মতই শান্তস্বরে বললো, 'দুঃখের সঙ্গে বলছি, কথাটা তুমি আমাকে বলতে বাধ্য করলো।'

—'হ্যাঁ—হ্যাঁ বলো'। ফ্রান্সিস একটু হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে।

—'পাঁচদিন আগে তোমার মা মারা গেছেন।'

ফ্রান্সিস কেমন যেন শূন্যদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। একটা কথাও বলতে পারল না। চোখের সামনে ও যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ও আস্তে-আস্তে জাহাজ-ঘাটার সঙ্গে লাগিয়ে রাখা, পাটাতন দিয়ে হেঁটে জাহাজ-ঘাটায় নামলো।

বিস্কো ছুটে এলো হ্যারির কাছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো, 'ওকে এই অবস্থায় একা ছেড়ে দিলে?' বলেই ও ফ্রান্সিসের দিকে ছুটে যেতে গেল।

হ্যারি ওকে আটকে। বললো, 'ওকে একাই যেতে দাও, আমরা বরং জাহাজে থাকি।'

ওদিকে ফ্রান্সিসকে জাহাজ থেকে নামতে দেখে, জনতার ভীড়ে উল্লাসধ্বনি উঠলো— 'ফ্রান্সিস দীর্ঘজীবী হও।'

ইতিমধ্যে সবাই ঘিরে ধরলো ফ্রান্সিসকে। সকলেই ওর সঙ্গে করমর্দন করতে চায়—ওর গায়ে হাত দিতে চায়। কিন্তু ওর নিরাসক্ত-উদাসীন ভাব দেখে সকলেই একটু আশ্চর্য হলো। ফ্রান্সিস দৃঢ় পায়ে ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে গেল। সবাই ওকে যাবার পথ করে দিল। সে কোনদিকে তাকালো না। সোজা গিয়ে একটা গাড়িতে উঠলো, গাড়ি চলতে শুরু করলো। কেউই তার এই নিরাসক্ত ব্যবহারের কারণ বুঝলো না। তবু দু'পাশে ভীড় করে লোকেরা গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে যেতে লাগলো।

ফ্রান্সিস হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো, 'গাড়ি জোরে চালাও।'

গাড়ির কোচম্যান সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। ভীড় পেছনে রইলো। গাড়ি দ্রুতগতিতে ছুটলো। বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। আস্তে-আস্তে গাড়ি থেকে নামলো। দেখলো, সেই নীলফুলের লতাগাছটা দেয়ালের গায়ে আরো—আরো অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। কত নীলফুল ফুটে আছে। এই গাছটা তো মা-ই লাগিয়েছিল।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকলো ফ্রান্সিস। ফুলে-ফুলে ছেয়ে আছে সারা বাগানটা। মা'র বরাবরের অভ্যেস ছিল, খুব সকালে বাগানটার পরিচর্যা করা। দাঁত-ফোকলা মালীটাকে নিয়ে সারা সকালটাই মা'র এই বাগানে কাটতো। ফুলগাছের জটলার মধ্যে থেকে মালীটা তখনি উঠে দাঁড়ালো—হাতে বেল্‌চা। বোধহয়, ফুলগাছের নীচের মাটি আল্‌গা করে দিচ্ছিল। ওকে দেখেও কিন্তু বরাবরের মত ফোকলা দাঁতে হাসলো না। কেমন চুপ করে, একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো।

ফ্রান্সিস বাড়ির ভেতর ঢুকল। যেখানে যে জিনিস থাকবার, তাই আছে। মা যেমন করে ঘরদোর সাজিয়ে রাখত, সেভাবেই সব সাজানো রয়েছে। ও নিজের ঘরে ঢুকলো। বিছানা আসবাবপত্র সব পরিছন্ন ভাবে গোছানো, যেমন বরাবর দেখে

এসেছে। বিছানায় বসলো একটু, ভালো লাগলো না বসে থাকতে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মা'র ঘরে। সব পরিপাটি সাজানো। বিছানাটা বরাবরের মতো সুচারুভাবে পাতা, যেন এক্ষুনি এসে শোবে। শেষের দিকে মা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যখন-তখন এসে বিছানায় শুয়ে থাকতো। বাবার ঘরে গেল ও, সেই একই ভাবে সাজানো-গোছানো। দেয়ালে মা'র একটা ছবি, হাতে আঁকা রঙিন ছবি। ও এক দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ছবিতে হাসি-হাসি মুখ। এমনি হাসি-হাসি মুখেই মা বলতো—'হ্যাঁরে, কবে তোর পাগলামি সারবে? বুড়ী মা'টার কথা কি তোর একবারও মনে পড়ে না?'

ফ্রান্সিস আর তাকিয়ে থাকতে পারল না। পাগলের মত সারা বাড়িতে প্রতিটি ঘর ঘুরে বেড়ালো। বাবা আর ছোট ভাইটা বাড়ি নেই। কাউকে পেলো না, শূন্য বাড়ি—মা নেই। ভাবতে-ভাবতে ছুটে এলো নিজের ঘরে। তারপর বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠলো। সমস্ত শরীর ওর কাঁপতে লাগলো। বুকটা যেন খালি হয়ে গেছে—শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। শরীরের এই অবস্থা নিয়ে ও কাঁদতে লাগলো।

কখন বিকেল হয়েছে ও জানে না। হঠাৎ বাবার ডাক শুনলো, 'ফ্রান্সিস—'

ও বিছানা থেকে আস্তে-আস্তে উঠে বসলো। দেখলো, বাবা আর ছোট ভাই দরজায় দাঁড়িয়ে। ও চোখ মুছে নিল। বাবা আস্তে-আস্তে এসে বিছানায় ওর পাশে বসলেন। একটু কেশে নিয়ে সহজভাবেই বললেন 'রাজবাড়ীতে তোমাদের ফেরার সংবাদ পেয়েছি।'

একটু থেমে বললেন, 'শরীর ভালো আছে তো?'

ফ্রান্সিস মাথা নাড়লো। ভাবলো, বাবা এত সহজভঙ্গীতে কথা বলছেন, যেন কিছুই হয় নি। ও বাবার মুখের দিকে তাকালো। বাবা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ উঠে চলে গেলেন। ছোট ভাইটা তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে। ফ্রান্সিস ওকেই ডাকল, ও কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাঁরে, মা খুব কষ্ট পেয়েছিল?'

—'নাঃ।' ভাইটি মাথা নাড়লো। বললো, 'সেদিন বিকেল থেকে হঠাৎ শরীরটা ভালো লাগছে না বলে, বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। বাবা বাড়িতেই ছিলেন। রাজ-বৈদ্যকে ডেকে আনা হলো। মা তখনও জ্ঞান হারায় নি। কেবল তোমার কথা বলছিল—'পাগল ছেলেটা এখনও ফিরলো না—ওকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে।'

কথাটা শুনে ফ্রান্সিস আর নিজেকে সংযত করতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, ওর ভাইয়ের চোখেও জল এলো। একটু সুস্থির হয়ে ফ্রান্সিস বললো, 'তারপর?'

—'সন্ধ্যের সময় মা জ্ঞান হারালো। রাজবদ্যি ওষুধ-টষুধ দিল, কিন্তু কাজ হলো না। সারারাত এভাবে কাটালো। ভোরের দিকে একটু জ্ঞান ফিরেছিল, চারদিকে তাকাচ্ছিল মা। তারপর আবার অজ্ঞান। একটু বেলা হতেই মা—'

ও আর বলতে পারল না। ফ্রান্সিস অনেকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটা পাখি কিচ্ কিচ্ শব্দ করে একবার ঘরে ঢুকেছে, আবার

বেরিয়ে যাচ্ছে। ও একসময় চোখ ফিরিয়ে দেখলো, ভাইটি ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

রাতের দিকে হ্যারি-বিস্কোরা কয়েকজন এলো। সবাই চুপ-চাপ বসে রইলো. কথা বললো, না বেশী। আগে যখন আসত, কত কথা হতো ওদের মধ্যে। কিন্তু আজকে সবাই চুপচাপ। ফ্রান্সিস এখনও মা'র মৃত্যুশোকের ধাক্কাটা পুরোপুরি সামলাতে পারে নি। তাই ওর মন চাইছিল অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে। তাই জিজ্ঞেস করলো, 'এরিক দ্য রেডের' গুপ্তধন কীভাবে আনা হলো ?'

—'সব উৎসব, শোভাযাত্রা রাজা বাতিল করে দিয়েছেন। রাজবাড়ির একটা গাড়িতে করে বাক্সটা এনে রাজার যাদুঘরে রাখা হয়েছে।' হ্যারি বললো।

—'আসল কথা তোমার মা'র মৃত্যুতে রাজা অত্যন্ত শোক পেয়েছেন। তিনি কোনরকম আনন্দ-উৎসব এ-সময় করতে চান না।' বিস্কো বললো।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বললো না। আরো কিছুক্ষণ বসে রইলো ওরা। তারপর একটু রাত হতে সকলে চলে গেল।

ফ্রান্সিস যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। কোথাও বেরোয় না। চুপচাপ নিজের ঘরে বসে থাকে। কখনও কখনও মা'র ঘরে গিয়েও বসে থাকে। সেদিন মা'র ঘরের কাছে এসে দেখলো, বাবা একদৃষ্টিতে মা'র ছবিটার দিকে তাকে আছে। চোখের জল গাল বেয়ে পড়েছে। এই ঘটনাটা ওর মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। বুঝলো, বাবাকে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। বড় চাপা স্বভাবের মানুষ। বুঝলো, বাবার শোক ওর চেয়ে কিছু কম নয়।

সারাদিন ফ্রান্সিসের একা-একা কাটে। রাতের দিকে বন্ধুরা আসে। একটু কথাবার্তা হয়, তারপর ওরা চলে গেলে আবার ও একা। এভাবেই দিন কাটতে লাগলো ওর। এর মধ্যে একদিন রাজা রাজপরিবারের একটা গাড়ি পাঠালেন ফ্রান্সিসের কাছে। কোচ্‌ম্যান এসে ওর সঙ্গে দেখা করলো। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে রাজার একটা চিঠি ওর হাতে দিল। চিঠিটা পড়লো ও, ছোট্ট চিঠি—

'স্নেহের ফ্রান্সিস,

তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। তবু আমার কাছে একবার এসো।'

নীচে রাজার স্বাক্ষর। রাজা ডেকেছেন কাজেই একবার যেতেই হবে। ও যখন সাজপোষাক পরছে, তখনই মা'র কথা মনে পড়লো। রাজবাড়িতে যাবার সময় মা'ই ওকে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিত। পোষাক পরতে-থাকা ওর হাতটা থেমে গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ও। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো। ও আবার পোষাক পরতে লাগলো। অনেকদিন পরে আয়নায় নিজের মুখ দেখলো। বেশ রোগাই হয়ে গেছে, ও এটা বুঝলো। মাথায় শেষবারের মতো চিরুনী বুলিয়ে ও গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

গাড়ি চললো। গ্রীনল্যান্ড থেকে এসে পর্যন্ত ও বাড়ির বাইরে বেরোয় নি। এতদিন পরে পথে বেরিয়ে ওর ভালোই লাগলো। জমজমাট বাজারের কাছে আসতে গাড়ির গতি কমে এলো। রাস্তার ভীড়ের মধ্যে যারাই ওকে চিনল, তারাই হেসে হাত নাড়লো। অগত্যা ওকেও কখনও-কখনও হাত নাড়তে হলো, হাসতেও হলো।

একসময় গাড়ি রাজবাড়িতে এসে পেঁছিল। রাজার একজন দেহরক্ষী ওকে

রাজবাড়ির মধ্যে নিয়ে চললো। সাজানো-গোছানো দেয়ালে, জানালায় নানা কারুকাজ করা অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে মন্ত্রণা কক্ষের সামনে এসে দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে দেহরক্ষী চলে গেল। ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকে দেখলো, রাজা বসে আছেন। সামনে শ্বেতপাথরের বিরাট গোল টেবিল। আঁকা-বাঁকা আবলুস কাঠের পায়াঅলা কয়েকটা সবুজ গদী-আঁটা চেয়ার টেবিলের চারপাশে পাতা। রাজাকে ও মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। রাজা ওকে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

রাজা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ফ্রান্সিস, তোমার মা'র মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক পেয়েছি। রাজবাড়ির উৎসবে উনি বড় একটা আসতেন না। তবু যে ক'দিন তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁর কথাবার্তা ব্যবহারে এটা বুঝেছিলাম, উনি খুব শিক্ষিতা ও রুচিশীলা মহিলা ছিলেন।'

রাজা থামলেন। ফ্রান্সিস কী বলবে বুঝে উঠতে পারলনা, ও চুপ করে রইলো।

রাজা একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'তোমাকে যে-কারণে ডেকে পাঠিয়েছি সেটা বলি।'

—'বলুন।'

—'এরিক দ্য রেডের যে ধনসম্পদ তুমি এনেছ, সেটা কী করতে চাও?'

—'আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন।'

—'তা হয় না ফ্রান্সিস। এনর সোক্কাসন এটা ব্যক্তিগতভাবে তোমাকেই দিয়েছেন। তুমি যা বলবে তাই হবে'।

—'আমি এখন—মানে—ঠিক গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছি না।'

রাজা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আমারই ভুল হয়েছে। তোমার এই মানসিক অবস্থায়—ঠিক আছে, তুমি পরেই বলো।'

—'তাহ'লে আমাকে যাবার অনুমতি দিন।'

—'হ্যাঁ, এসো। আমরা পরে কথা বলবো।' রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে সম্মান জানালো। তারপর ঘরের বাইরে চলে এলো। দেহরক্ষী ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে পাশে নিয়ে দেউড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

ফ্রান্সিসের দিন একইভাবে কাটতে লাগলো। তবে এখন ও আর বাড়িতে সবসময় থাকে না। মাঝে-মাঝে বিকেলের দিকে বেরোয়। লোকজনের ভীড় এড়িয়ে সমুদ্রের ধারে আসে। নোঙর করা জাহাজগুলো দেখে। লোভ হয়, আবার একটা জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে। সাত-পাঁচ ভাবে, আর এক-একা সমুদ্রের তীরে ঘোরে।

একদিন এইরকম সমুদ্রের তীরে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্য করেননি, রাজবাড়ির একটি সুদৃশ্য ঘোড়ার গাড়ী ওর কাছাকাছি এসে থামলো। ও নিজের মনেই সমুদ্রের দিকে মুখ করে হাঁটছিল। ঝালর লাগানো রঙীন পোষাক পরা রাজবাড়ীর কোচ ম্যান ওর সামনে এসে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বললো, 'আপনাকে রাজকুমারী ডাকছেন।'

ফ্রান্সিস ঘুরে তাকিয়ে দেখলো, 'রাজকুমারী মারিয়া একা গাড়িটায় বসে আছে। ওকে দেখে মৃদু হাসল। ও গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেল। রাজকুমারীকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো। রাজকুমারী বললো, 'খুব যদি ব্যস্ত না থাকেন, আমার

গাড়িতে আসতে পারেন।'

ফ্রান্সিস একটু দ্বিধায় পড়লো, ওর মন চাইছিল একা-একা ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু ওদিকে রাজকুমারীর আমন্ত্রণও উপেক্ষা করা যায় না। অগত্যা ও গাড়িতেই উঠল। রাজকুমারীর নির্দেশে গাড়ি চললো। ঝলমলে পোষাক পরা রাজকুমারী, গাড়ির ভেতরে একটা তৃপ্তিদায়ক সুগন্ধ, উজ্জ্বল সূর্যের আলো, ঘোড়ার পায়ের শব্দ—এই সবকিছু হঠাৎ ওর ভালো লাগলো।

রাজকুমারীর সেই উচ্ছলতা আজকে নেই। হয়তো শোকগ্রস্ত ফ্রান্সিসের সামনে সেটা বেমানান লাগবে, এইজন্যেই রাজকুমারী চুপ করে রইলো। গাড়ি চললো। একসময় রাজকুমারী বললো, 'আপনার মা'র মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোক পেয়েছি'।

ফ্রান্সিস চুপ করে রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে রইলো। কোন কথা বললো না। রাজকুমারী বললো, 'আপনার শরীরটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে।'

ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। রাজকুমারী বললো, 'যদি আপনার ইচ্ছে হয়, আমাদের বাড়ি যেতে পারেন। অনেকদিন আপনার মুখে গল্প শুনিনি।'

প্রথমে ওর যেতে ইচ্ছে হলো না। একা থাকতেই ভালো লাগছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ইচ্ছে হলো। ওখানে গেলে, রাজকুমারীর সঙ্গে কথাবার্তা বললে হয়তো মনটা একটু শান্ত হবে। ফ্রান্সিস বললো, 'আজকে নয়, আর একদিন গাড়ি পাঠাবেন যাবো।'

মারিয়া তারপর ওর গ্রীনল্যান্ড অভিযান নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো। ফ্রান্সিস ওর কথা বলার প্রিয় বিষয় পেয়ে গেল। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েই ও মধ্যরাত্রিতে সূর্য দেখবার অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস সেই আগের ফ্রান্সিস হয়ে গেল। উৎসাহের সঙ্গে ও বরফের দেশে ওর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগলো। মারিয়া খুশী হলো যে, ফ্রান্সিস ওর শোকাহত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে মারিয়া ওর গল্প শুনতে লাগলো। গাড়ি এসে দাঁড়ালো ফ্রান্সিসদের বাড়ির দরজায়।

মারিয়া আগেই কোচ্‌ম্যানকে সেই নির্দেশ দিয়েছিল। ফ্রান্সিস অগত্যা গল্প থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলো। মারিয়া মৃদুস্বরে বললো, 'আবার গাড়ি পাঠাবো—আসবেন কিন্তু।'

ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো।

আস্তে-আস্তে ফ্রান্সিসের মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেল। ও আবার আগের মতই হয়ে উঠলো। বন্ধু-বান্ধবেরা আসে, জোর আড্ডা ও গল্প-গুজব চলে।

এর মধ্যে মারিয়া দু'দিন গাড়ি পাঠিয়েছিল। ফ্রান্সিস সেজে-গুজে রাজবাড়ি গেছে। এরিক দ্য রেডের গুপ্তধন আবিষ্কারের গল্প বলেছে। গালে হাত দিয়ে অবাক হয়ে মারিয়া সেই গল্প শুনেছে। গল্প বলতে-বলতে কখনও মা'র কথা মনে পড়েছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থেকেছে ও। মারিয়া বুঝতে পেরেছে সেটা। মৃদুস্বরে বলেছে, 'মা'র কথা ভেবে মন খারাপ করো না। আমি তোমার একজন শুভার্থী বন্ধু। তোমার মনে কোন দুঃখ না থাক, এটাই আমি চাই।'

এই সহানুভূতির কথায় ফ্রান্সিস দুঃখ ভোলে। বলে, 'আমি জানি। তাই তোমার কাছে এলে আমি দুঃখ ভুলে যাই।'

এরকম মাঝে-মাঝেই ফ্রান্সিস রাজবাড়িতে যেতে লাগল। মারিয়ার সঙ্গে ওর হৃদ্যতা বেড়েই চললো।

* * *

ফ্রান্সিসের বাবা একদিন সন্ধ্যেবেলা ওকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালো। ও ঘরে ঢুকে দেখলো, বাবা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। ও বললো, 'বাবা, আমাকে ডেকেছিলে?'

—'হ্যাঁ।' বলে বাবা ফিরলেন। 'বসো—একটা জরুরী কথা আছে।'

ফ্রান্সিস বসলো। বাবা একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'দেখো, তোমার মা বেঁচে থাকলে, তিনিই সব ব্যবস্থা করতেন। যাকগে, কথাটা হলো—রাজামশায়ের খুব ইচ্ছে, তুমি রাজকুমারী মারিয়াকে বিয়ে করো।'

ফ্রান্সিস অনুমান করেছিল, এমনি একটা কথা উঠবে। কাজেই ও খুব আশ্চর্য হলো না এতে।

বাবা বলতে লাগলেন, 'রাজা-রানী দু'জনেই কয়েকদিন ধরেই বলছেন।' একটু থেমে বললেন, 'রাজকুমারী মারিয়াকে ছোটবেলা থেকেই জানি। ওর মতো বুদ্ধিমতী সহৃদয় মেয়ে হয় না। আমার মত যদি জানতে চাও তাহ'লে বলি, এই বিয়ে হলে আমি খুব খুশী হবো। তোমার মা বেঁচে থাকলে তিনিও খুশী হতেন।'

ফ্রান্সিস বাবার মুখের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারলো না। মাথা নীচু করে আস্তে-আস্তে বললো, 'তুমি খুশী হলে আমার আপত্তি নেই।'

বাবা হেসে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। এগিয়ে এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

রাজামশাই একদিন রাজসভায় বিয়ের কথাটা ঘোষণা করলেন। রাজ্যের লোকেরা খুব খুশী হলো। বন্ধুরা দল বেঁধে এসে ফ্রান্সিসকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল।

রাজকুমারী মারিয়া এরপর আর গাড়ি পাঠায় না। ফ্রান্সিসও লজ্জায় আর রাজবাড়ি যায় না।

এক শুভদিনে নগরের সবচেয়ে বড় গীর্জায় রাজকুমারী মারিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সিসের খুব আড়ম্বর করে বিয়ে হয়ে গেল। সাতদিন ধরে উৎসব চললো। 'এরিক দ্য রেডের' গুপ্তধনের বাক্সটা রাজকুমারী যৌতুক হিসেবে পেলো।

একে রাজকুমারীর বিয়ে, তাও আবার সকলের প্রিয় ফ্রান্সিসের সঙ্গে। দেশের অধিবাসীরা আনন্দে যেন পাগল হয়ে গেল। হৈ-হল্লা, খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান সাতদিন ধরে।

হাজার-হাজার বাজী পুড়লো রাতের আকাশে।

— শেষ —
